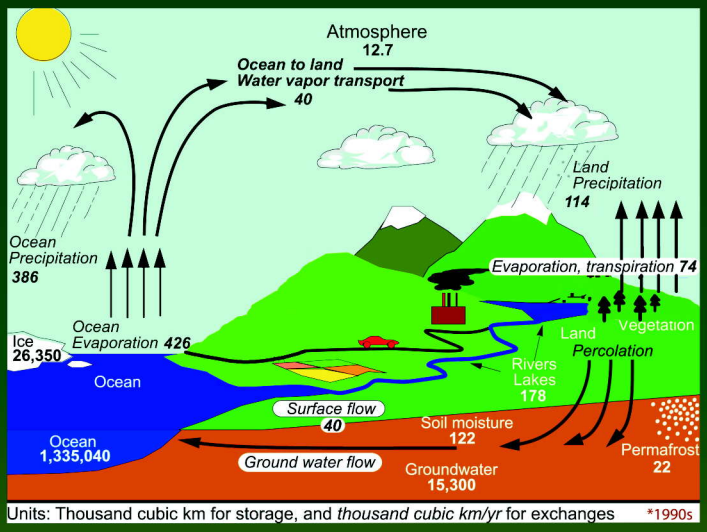

Registration No.: S/IL/97407 of 2012-13

বিজ্ঞান মনস্ক'র মুখপত্র

সমীক্ষণ

নবম বর্ষ❖সংখ্যা ৩❖অগাস্ট ২০১৯

ভারত কী তীব্র জলসঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ?

–ঃ সূচীপত্র ঃ–

■**সম্পাদকীয় ঃ** ২
বিজ্ঞানের ছদ্মবেশে অবিজ্ঞান

■**চিঠিপত্র ঃ** ৩

■**সমাজ দর্পণ ঃ** ৬
আবার বিহারে শিশুদের মৃত্যু মিছিল

■**বিশেষ রচনা ঃ** ৮
ভারত কী তীব্র জলসঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ?

■**কুসংস্কার টিকিয়ে রাখে কারা ঃ** ২২

■**ইতিহাসের পাতা থেকে ঃ** ২৪
অপবিজ্ঞান – রাজশেখর বসু

■**ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ** ২৭
মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

■**স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব ঃ** ৩৩
বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা ও যুক্তিবাদের পুরোধা
অক্ষয় কুমার দত্ত

■**বিজ্ঞানের খবর ঃ** ৩৬

■**সংগঠন সংবাদ ঃ** ৩৮

সম্পাদকীয়

বিজ্ঞানের ছদ্মবেশে অবিজ্ঞান

আধুনিক জিনতত্ত্বের অন্যতম স্থপতি তথা জিনের আনবিক গঠনের অন্যতম আবিষ্কারক ডঃ জেমস ওয়াটসন সম্প্রতি খবরের শিরোনামে এসেছেন। শিরোনামে আসার কারণ হল তার জাতি-বিরোধী মন্তব্য। তিনি বলেন, "আমি আফ্রিকানদের বৌদ্ধিক উন্নতির ব্যাপারে সন্দিহান। মার্কিন সমাজের সমস্ত নিয়ম-নীতি গঠন করা হয় সাদা ও কালো মানুষদের বুদ্ধি সমান ধরে নিয়েই। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখাচ্ছে যে, এই ধারণা ভ্রান্ত। আমি চাই সকলে সমান থাকুক, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে যারা কালো মানুষদের সঙ্গে কাজ করেন তারা এই বুদ্ধির তারতম্যটা বোঝেন। কালো ও সাদা মানুষদের মধ্যে বুদ্ধির তারতম্য একান্তই জিনের গঠনজনিত তারতম্যের জন্যই।" জিন তথা ডিএনএ-র দ্বি-সর্পিল (ডাবল হেলিক্স) আকারের ব্যাখ্যা দিয়ে ১৯৬২ সালে বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ক্রিক ও মরিস উইলকিন্সের সঙ্গে নোবেল পুরস্কার জিতেছিলেন জেমস ওয়াটসন। এছাড়াও তাঁর ঝুলিতে রয়েছে একাধিক আন্তর্জাতিক সম্মান। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বৈজ্ঞানিকের এ হেন জাতি-বিদ্বেষী মন্তব্য বিশ্বজুড়ে অনুরণিত হয় এবং তা বিজ্ঞান-দুনিয়ায় আলোড়ন ফেলে দেয়।

বিজ্ঞান এখনো 'বুদ্ধি'-র অদ্বিতীয় সংজ্ঞা নিরুপন করতে পারেনি। 'নেচার' না 'নারচার'? অর্থাৎ জিন নাকি পরিবেশ? বুদ্ধির বিকাশে কোনটা কিভাবে ভূমিকা রাখে, এ নিয়ে রয়েছে নানা মুনির নানা মত। তবে এই বিষয়ে গবেষণা করেছেন বা করছেন যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক তাদের মধ্যে সকলেই বুদ্ধির বিকাশে পরিবেশের ভূমিকাই যে প্রধান তা একবাক্যে মেনে নিয়েছেন। এটা পরীক্ষিত সত্যও বটে। যদিও, কোন কোন বিজ্ঞানী বুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত জিনের সন্ধান পেয়েছেন ব'লে দাবী করলেও পরিবেশের ভূমিকাকে অস্বীকার করেন নি।

ওয়াটসনের এই বেপরোয়া মন্তব্য বর্ণগত দ্বন্দ্বকে উস্কে দিয়েছে। যে বিষয়ে বিজ্ঞান এখনও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি সেই বিষয়ে আগবাড়িয়ে কোন মন্তব্য করা সমাজসচেনতা তো নয়ই, বরং তাকে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা বলে। আর, ওয়াটসনের মতো খ্যাতিমান বিজ্ঞানীরা যারা ইতিমধ্যে বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাঁদের মন্তব্যের সামাজিক প্রভাব যে পড়বে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই ক্ষেত্রে ওয়াটসনের বক্তব্য যে কৃষ্ণাঙ্গ বিরোধীদের যুক্তিকে দৃঢ় করবে

তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাই ওয়াটসনের চিন্তাকে অপবিজ্ঞান বা ছদ্মবিজ্ঞান বললেও কম বলা হয়।

অপবিজ্ঞান হল কোন বিষয় বা ঘটনাকে ভুল বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে তা বিজ্ঞান ব'লে চালানোর প্রয়াস। অর্থাৎ অপবিজ্ঞান হল বিজ্ঞানের ছদ্মবেশে অবিজ্ঞান। প্রোথিতযশা বিজ্ঞানীরা যখন সচেতন বা অসচেতনভাবে এই কাজে লিপ্ত হন তখন এর সামাজিক প্রভাব হয় অত্যন্ত ক্ষতিকর। বিজ্ঞানীদের এই পদক্ষেপগুলিকে শাসকশ্রেণী সচেতনভাবে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া শাসকশ্রেণী নিজের অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য অপবিজ্ঞান বা ছদ্মবিজ্ঞানের আশ্রয় নেয় ও বিজ্ঞানীদের একাংশকে সেই কাজে ব্যবহার করে। এর যথেষ্ট উদাহরণ রয়েছে।

বর্তমানে, জলবায়ু পরিবর্তন, বিশ্বউষ্ণায়ন, পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট, জল-সঙ্কট, খরা, বন্যা ইত্যাদির পিছনে মনুষ্য ক্রিয়াকলাপকে দ্বিধাহীনভাবে দায়ী করা হচ্ছে ও রাষ্ট্রের দায়িত্বকে আড়াল করা হচ্ছে। যেহেতু, পৃথিবীব্যাপী এই বিশাল কর্মকান্ড জনমত ছাড়া সম্ভব নয়, তাই তাদের এই কাজে ছলনার আশ্রয় নিতে হয়। অস্ত্র হিসাবে তারা অপবিজ্ঞান বা ছদ্মবিজ্ঞানকে ব্যবহার করে। তাদের শেখানো বুলিতে সাধারণ মানুষ কথা বললে তাদের মুখে সাফল্যের হাসি ফুটে ওঠে। সাধারণ মানুষের চেতনার স্তরে অপবিজ্ঞানের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে, ফলে সামাজিক স্তরে তৈরী হচ্ছে চরম বিভ্রান্তি। পুরাণ ও ইতিহাস, ফলিত জ্যোতিষচর্চা ও জ্যোর্তিবিজ্ঞানকে সমার্থক বলে চালানোর অপচেষ্টার পিছনে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ মদত থাকছে। রাষ্ট্র নায়করা জাতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মঞ্চে বিজ্ঞানীদের সামনে দাঁড়িয়ে লাগাতার অবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রচার করছে।

সাধারণ মানুষের বিজ্ঞানের উপর আস্থা থাকলেও, অধিকাংশ মানুষ বিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞানের মধ্যে তফাৎ করতে পারেন না। তাই সহজেই প্রভাবিত হয়ে পড়েন। বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই মানুষের বিজ্ঞান ও অবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার চেতনা গড়ে উঠতে পারে। একমাত্র বিজ্ঞানমনস্ক মানুষই বিজ্ঞানের ছদ্মবেশে অপবিজ্ঞানের মোকাবিলা করে সমাজে সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক চিন্তা চেতনা প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

বিজ্ঞানমনস্ক মানুষকে মনে রাখতে হবে যে এই রাষ্ট্র তথা সমাজের শীর্ষস্থানীয়দের দ্বারা সংগঠিত অপবিজ্ঞানের প্রচার সাধারণ মানুষকে সত্যসন্ধান থেকে দূরে সরিয়ে রাখার লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়। কারণ বিজ্ঞানমনস্কতা মানুষকে সমাজ সচেতন করে, অধিকার সচেতন করে অন্যায় শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির প্রেরণা দেয়।■

চিঠিপত্র ঃ

সবার মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা ও যুক্তিবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য সাধুবাদ জানাই!

'সমীক্ষণ' (নবম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০১৯) এর লেখাগুলো পড়লাম। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস নিয়ে আলোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক ও যথাযথ। প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান চর্চা নিয়ে যেসব ভণ্ডামি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় করার চেষ্টা হচ্ছে তার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানমনস্ক মানুষদের প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়া দরকার। বিজ্ঞানমনস্ক তাদের পত্রিকায় এই প্রতিবাদ জানিয়েছে দেখে ভালো লাগলো। ধারাবাহিক নিবন্ধ 'মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ' (দ্বিতীয় পর্ব)-এ বিজ্ঞানের জটিল তথ্যগুলো সহজ সরল ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। পড়ে ভালো লাগলো। 'কলকাতা শহর ও শহরতলীর অঞ্চল ভূমিকম্পে আদৌ নিরাপদ কি?' আলোচনাটি সবসময়ের জন্যই প্রাসঙ্গিক। লেখাটি এই অঞ্চলের ভূকম্পীয় অবস্থা এবং নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে সরকারী নিয়মাবলী সংশোধনের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে অধিবাসীদের সচেতন করবে-এই আশা রইল। ভুত নিয়ে লেখাটিও বেশ ভালো ও বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। তবে কয়েকটি ব্যাপারে কিছু বলতে চাই। যেমন –

(১) বানান ভুল। র ও ড়-এর ব্যবহারের ভুল প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ঘটেছে। (যেমন, 'কোপার্নিকাসের মহাবিশ্বের ধারণা আকাশ থেকে পরেনি' - পৃষ্ঠা ২১, দ্বিতীয় লাইন। '... বহুমাত্রিক আলোড়ন পরে গেল' - পৃষ্ঠা ৩০। নিচে দাগ দেওয়া শব্দ গুলিতে 'র' এর জায়গায় 'ড়' হওয়া উচিত। এই বানানের ভুল অন্যান্য সংখ্যা গুলোতেও লক্ষ্য করেছি। এছাড়াও বেশ কয়েকটি ভুল বানান রয়েছে। পৃষ্ঠা ২৪ এবং ২৫-এ O^1, O^1X^1, O^1Y^1, O^1Z^1 এর বদলে যথাক্রমে O', $O'X'$, $O'Y'$, $O'Z'$ হবে, যেমনটি চিত্রে রয়েছে।

(২) পত্রিকাটির লেখাগুলিতে লেখক পরিচিতি দেখতে পাওয়া গেল না।

(৩) "মোবাইল ফোন মানুষের উপর কি প্রভাব ফেলেছে?" লেখাটিতে বেশকিছু সংখ্যাগত তথ্যের তথ্যসূত্র দেওয়া নেই।

(৪) ভূমিকম্প নিয়ে লেখাটিতে চিত্র ২-এ যে পাঁচটি অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে ওই চিত্রে সেগুলির কোন উল্লেখ নেই। এখানে (৪) নম্বর তথ্যসূত্রে www.researchgate.net/publication না দিয়ে লেখক এবং জার্নাল-এর নাম উল্লেখ

করে সঠিক তথ্যসূত্র দেওয়া উচিত ছিল। খুঁজে যা পাওয়া গেল – 'Effect of soil on Ground Motion Amplification of Kolkata City' - Amit Shiuly, Ramendu Bikash Sahu, Saroj Mandal, International Journal of Geotechnical Earthquake Engeneering,5(1) : pp1-20, January 2014.

সবার মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা ও যুক্তিবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য বিজ্ঞান মনস্ক-এর প্রয়াসকে সাধুবাদ জানাই এবং পত্রিকাটি সুষ্ঠু ভাবে প্রকাশিত হতে থাকুক এই কামনা করি।

প্রবীর কুমার গোল
শিক্ষক, ধোসা চন্দনেশ্বর নবীনচাঁদ হাইস্কুল (উঃমাঃ)
ধোসা, জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

গাছ বাঁচানোর দায়িত্ব কার ?
কে বাঁচায় ? নিধন করে কে ?

'একটি গাছ একটি প্রাণ', 'গাছ লাগান-প্রাণ বাঁচান' এরকম প্রচার সরকারের বিভিন্ন দপ্তর নিয়মিত করে থাকে। এছাড়া পঞ্চায়েত-পুরসভা বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বৃক্ষরোপণ উৎসব করে। গাছের চারা দেয়। সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পে ইউক্যালিপটাস-সোনাঝুরি এসব গাছ লাগান হয়। তাই আমার আগে ধারণা ছিল আমরা সকলে মিলে এক হয়ে বৃক্ষরোপণের কাজ করছি। পেশাগত কারণে যখন রেলযাত্রা করি তখন শহর ছাড়ালেই খোলা মাঠ চোখে পড়ে। অবশ্যই সমতল বা আমাদের এই মালভূমি এলাকায়, কাজের ব্যস্ততার মধেও বুঝতে পারি যেখানে অনেক গাছ জড়াজড়ি করে আছে সেটা একটা গ্রাম। রেল লাইনের কাছে হলে পুকুর-বাড়ির চাল এসব দেখা যায়। অর্থাৎ মানুষ তার চারপাশে গাছ নিয়েই বাঁচে। কারণ বলার প্রয়োজন নেই। যারা বই পড়ে শেখেনি তারাও জানে। রেডিও, টেলিভিশনে প্রচারের আগে থেকেই মানুষ জেনে এসেছে। যারা শহরে থাকেন, গরীব মানুষের তো শোয়ার ঘরের আব্রুটুকুও নেই, গাছ লাগাবার জায়গা তো বিলাসিতা। তবু দেখবেন বস্তি এলাকাতেও গাছ থাকে – বেড়া হয়ে, বেড়া ঘেঁসে, কলপাড়ে, নালার ধারে ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই গাছের মধ্যে বড় গাছ বেড়েও চলে। সাধারণতঃ কাউকে কাটতে দেখিনি। আর মধ্যবিত্তদের নিজস্ব বাড়ি থাকলে – একবর্গফুট মাটিতেও গাছ কিছু না কিছু থাকেই। তাই মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন জাগতো – এতো প্রচার কার জন্য? তবু মনে হত ভালইতো, সরকার কর্তৃপক্ষ ভাল কাজের কথা সবসময় স্মরণ করে দেবে এটাতো দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয়। কাগজে পড়েছি, খবরে শুনেছি – কাঠ মাফিয়ারা নাকি জঙ্গল কে জঙ্গল সাফ করে দিচ্ছে। প্রত্যেক্ষ কোন অভিজ্ঞতা ছিলনা, হালের ঘটনায় আমার চোখ খুলে গেল।

কাছেই রেল শহর আদ্রা। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের ডিভিশনাল সদর দপ্তর। ব্রিটিশ আমলের বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে বা বি. এন. আর। রেল লাইন আর স্টেশনটা শহরকে দুভাগে ভাগ করেছে। উত্তর এবং দক্ষিণ। শোনা কথা দক্ষিণ দিকে নাকি সাহেবদের বাস ছিল। ঘটনা হল ডিভিশনাল রেল ম্যানেজারের দপ্তর, হাসপাতাল, মিশনারী ও অন্যান্য স্কুল, উঁচু আধিকারীকদের বাংলো সবই দক্ষিণ দিকে। স্টেশন থেকে নেমে রাস্তার উপর দাঁড়ালো দুধারে গাছের ছায়া। তার মধ্যে দিয়ে পথ চলে গেছে। আমি বিশেষজ্ঞ নই তবে দেখলেই বোঝা যেত বহু পুরণো গাছ। শিশু, মেহগনী, সেগুন, তেঁতুল – বিরাট বিরাট গাছ। পুরুলিয়ার প্রখর গ্রীষ্মেও ছায়া দিয়ে যেত। এমনিতেই ছিল চওড়া রাস্তা। হঠাৎ শুনলাম রাস্তা চওড়া হবে, নিমেষে যন্ত্র-যন্ত্রী লেগে গেল, সেই বহুযুগের গাছ কাটা হতে শুরু হল। কে করছে? ভারত সরকারের রেল বিভাগ। বহু গাছ কেটে ফেলার পর কিছু বাকি রেখে নিজেই বন্ধ হল 'বৃক্ষ নিধন'। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, বিরোধ করাও কেউ নেই। কানাঘুষো শোনা যেতে লাগল – এটাও নাকি এক 'ঘোটালা'। ঘটনা হল রাস্তা চওড়া হতে শুরু হল। রাস্তার ধারে সেই মৃত মহীরূহগুলোর অবশিষ্ট অংশ পড়ে আছে। তার গায়েই ভারী-রকম কংক্রীটের খাঁচা বানানো হল – চারা লাগানোর জন্য। জানিনা জল-হাওয়া পেয়ে সেখানে গাছ পোঁতা হলে সেই গাছ বাঁচবে কিনা। হঠাৎই সেই বিরাট গাছগুলোর মৃতদেহ লোপাট হয়ে গেল। রাস্তা কিন্তু এতদূর এসে চওড়া হলনা। এখন আমি বুঝতে পারলাম 'বৃক্ষ নিধন উৎসব' কাকে বলে। যারা 'বৃক্ষ রোপনের জন্য' জনগণকে জ্ঞানদান করেন কোটি কোটি টাকার বিজ্ঞাপন দিয়ে, তারাই বৃক্ষ নিধনের কারিগর অথবা তাদের সহযোগী। তাই আমরা এক হয়ে গাছ বাঁচানোর – পরিবেশ বাঁনোর লড়াই করছিনা। একথা আমাদের জোরে জোরে প্রচার করতে হবে।

মৃন্ময় দত্ত
পুরুলিয়া

আধুনিক বিজ্ঞান খেটে খাওয়া মানুষের বেশি বেশি জানা প্রয়োজন

'বিগত সংখ্যায় (নবম বর্ষ, সংখ্যা-২) শ্রী সত্যেন্দ্র পালের পাঠানো চিঠি এবং সেই প্রসঙ্গে আপনার জবাব – দুটোই পড়লাম। পত্র লেখক বলেছেন – বিগত কয়েক সংখ্যা থেকে দেখছি "সমীক্ষণ" গণবিজ্ঞানধর্মী লেখা থেকে "এলিট" – ধর্মী লেখার দিকে ঝুঁকছে।' এই এলিটধর্মী লেখা বলতে লেখক ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন? সমস্ত চিঠিটার থেকে বেরিয়ে এসেছে – এই যে বুর্জোয়াদের অর্থে ও মদতে যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়ে চলেছে, সে সংক্রান্ত বিষয় লেখাই লেখকের মতে এলিট ধর্মী লেখা। তিনি বিজ্ঞানকে এক্ষেত্রে 'বুর্জোয়া বিজ্ঞান' – এই বিশেষণে অভিহিত করেছেন। তিনি 'বুর্জোয়া বিজ্ঞান' চর্চার পরিবর্তে খেটে খাওয়া মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিজ্ঞান চর্চায় আগ্রহী। লেখকের এই আগ্রহ অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু বুর্জোয়াদের কবলমুক্ত বিজ্ঞান চর্চার জন্য পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে এমন একটুকরো ভূখন্ড প্রয়োজন যে অঞ্চল বুর্জোয়াদের শাসন থেকে মুক্ত। আজকের পৃথিবীতে এমন জায়গা কোথাও নেই। তা হলে আমাদের চর্চার বিষয় হবে শ্রমিকশ্রেণীর শাসনাধীন অতীতের রাষ্ট্রগুলিতে কিরূপ বিজ্ঞান চর্চা হয়েছে, সেগুলো। আমি মনে করি এই ধরনের লেখার প্রকাশ প্রয়োজন আছে। কিন্তু এগুলো ছাড়া আমরা বিজ্ঞান সংক্রান্ত যাবতীয় লেখালেখি যাই করিনা কেন (সেই গবেষণা-আবিষ্কার-উদ্ভাবন) সবই সাধারণ জনগণের দ্বারা সৃষ্ট হলেও তাতে বুর্জোয়াদের স্বার্থ প্রধানভাবে থাকবেই। লেখক নিশ্চয় মনে করেন যে খেটে খাওয়া জনগণ কেবলমাত্র কায়িক শ্রম দানকারী শ্রমিক নন, কেবলমাত্র অদক্ষ কম মজুরি পাওয়া শ্রমিক নন। আর বুর্জোয়া ব্যবস্থায় লেখক ভাল করেই জানেন যে বুর্জোয়াশ্রেণী সমগ্র উৎপাদন পদ্ধতি থেকে প্রায় বিযুক্ত। তারা লভ্যাংশ খায় বসে বসে, কিছু না করে। আর এই পৃথিবীর সব কিছু চলছে নানা রকম খেটে খাওয়া মানুষদের শ্রমের ফলে। এমনকী বুর্জোয়াদের শ্রেণী রাষ্ট্রকে, যাকে শ্রমিক শ্রেণী মনে করে দমনপীড়নের যন্ত্র – সেই যন্ত্রটাকেও চালাতে হলে মজুরি পাওয়া মানুষই লাগে। দৈনন্দিন জীবনে খেটে খাওয়া এই সকল মানুষের যাবতীয় বিজ্ঞান চর্চায় বুর্জোয়ারা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে আছে।

বুর্জোয়াদের অর্থে পুষ্ট বিজ্ঞান চর্চার ফল কিন্তু বুর্জোয়ারা একাই ভোগ করছে এমন নয়। এই বিজ্ঞানের সুফল সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষও পায়। উদাহরণস্বরূপ জিন নিয়ে গবেষণার ফল হিসেবে নানা প্রকার উচ্চফলনশীল ফসল চাষের ক্ষেত্রে কৃষিজীবী মানুষ আগ্রহী। চিকিৎসাবিজ্ঞানের আবিষ্কার হিসাবে যক্ষ্মার ওষুধ বিনাপয়সায় হাসপাতালে পাওয়া যায়। এবিষয় সরকারী গাফিলতি, উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব লক্ষ্যণীয়। খেটে খাওয়া মানুষকে এই জন্য জোট বাঁধতে হবে। কিন্তু সবটাই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুফল পাওয়ার জন্য – তা থেকে নিজেদের পৃথকীকরণ করে নয়। শুধু যক্ষ্মা নয় এমন অনেক অসুখের চিকিৎসা এখন পাওয়া যায় যা পেতে খেটে খাওয়া জনতা তাদের সাধ্যমত চেষ্টাও চালান। মহাকাশ নিয়ে গবেষণাকে খেটে খাওয়া মানুষের থেকে দূরতম বিষয় – এমনভাবে দেখাটাও ঠিক হবে না। কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্যাটেলাইটের ব্যবহারে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাষ প্রায় নিখুঁতভাবে পাওয়া যায়। এর ফল বুর্জোয়াদের তৈরী করা ব্যবস্থার কারণে মানুষ কখনো কখনো পায় না। ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সমুদ্রে সৃষ্ট আসন্ন সুনামির পূর্বাভাষ ভারত সরকার এই কারণেই জনগণকে দেয় নি। উল্টে প্রচার করেছিল ভূ-কম্পন বা সুনামির পূর্বাভাষই সম্ভব নয়। রীতিমত কাগজে বিজ্ঞাপণ দিয়ে ভারত সরকার এই সব মিথ্যা প্রচার করেছিল। আজ ভারত পয়সা দিয়ে সুনামি অ্যালার্মিং সিস্টেমের অংশীদার হয়েছে। আজকে 'ফণী' কিংবা 'বায়ু'-র পূর্বাভাষ আমরা সময় মতো পেয়ে হাজার হাজার সাধারণ মানুষের প্রাণ রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি। এসবই বুর্জোয়াদের তৈরী করা ব্যবস্থায় খেটে খাওয়া জনগণের প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছে। যদিও বিজ্ঞান শ্রেণী নিরপেক্ষ হওয়ায় 'বুর্জোয়া বিজ্ঞান' কথাটাই বেঠিক, তবু পত্রলেখক এই বিজ্ঞান বলতে যা বোঝাতে চেয়েছেন সেই বিজ্ঞানের সুফল পেয়ে আমরা এই জন্য গর্বিত হই, যে আগামী খেটে খাওয়া মানুষের সমাজ এই ধরনের বিপর্যয়ের জন্য দুশ্চিন্তা করবে না। আজকে তারা আন্দোলন করবে এই সকল আবিষ্কারের সুফল না পেলে বা ছিটে ফোঁটা পেলে। সেই কারণেই তাদের এগুলো আরো বেশি বেশি করে জানার প্রয়োজন। শুধু জানা নয় সেই সুফলগুলো পাওয়ার উপায়গুলোও খোঁজা প্রয়োজন।

রাজর্ষি রায়
কলকাতা

সমাজ দর্পণ ঃ

আবার বিহারে শিশুদের মৃত্যু মিছিল

এবছরের গ্রীষ্মের দাবদাহ চলাকালীন বিহারের মজফফ্‌রপুর, বৈশালী, পূর্ব চম্পারণ, শেওহর, সীতামারি সহ ১০টি জেলায় অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিনড্রোম (AES)-এ আক্রান্ত হয়ে প্রায় ২০০ শিশুর মৃত্যু হয়েছে, অসংখ্য শিশু হাসপাতালে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষারত। বেশির ভাগ শিশুই আক্রান্ত হয়েছেন মজফফ্‌রপুর জেলায়। সরকারি হাসপাতালে যারা মারা যাচ্ছেন একমাত্র তাদের হিসাবই আমরা জানতে পারছি। গ্রামে গঞ্জে যারা মারা যাচ্ছেন তাদের সংখ্যা এই তালিকায় নেই।

১৯৯৫ সালেই প্রথমবার AES-এর কারণে শিশুমৃত্যুর কথা সামনে আসে। এরপর থেকে প্রতিবছরই উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরসহ কয়েকটি জেলা, বিহারের মজফফ্‌রপুর, বৈশালীসহ কয়েকটি জেলা অথবা পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ইত্যাদিতে শয়ে শয়ে শিশুমৃত্যু ঘটে চলেছে। গোটা দেশে গত ৮ বছরে এই রোগে অন্তত ১১ হাজার শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

চিকিৎসক এবং বিশেষজ্ঞরা মৃত্যুর কারণ হিসাবে যা তুলে ধরেছেন সেগুলি আসল কারণ নয়, কতগুলি রোগলক্ষণের সমাহার। এর মধ্যে ভাইরাস ঘটিত সংক্রমণের পাশাপাশি সম্প্রতি যা বলা হয়েছে তা হল – অভুক্ত থাকার পর বা খালিপেটে লিচু খাওয়া। বলা হচ্ছে লিচুর মধ্যে থাকা মিথিলিন সাইক্লো প্রোপিল গ্লাইসিন (Methylene cyclo propyl ghycine and hypoglycien A) রক্তে গ্লুকোজ এর মাত্রা কমিয়ে দেয়, ফলে মস্তিষ্কে পর্যাপ্ত গ্লুকোজ পৌঁছায় না। তবে এটাই মৃত্যুর কারণ কি না তা নিশ্চিতভাবে এখনও বলা যায় না। তবে মশক বাহিক ভাইরাসের সংক্রমণই হোক আর লিচু খেয়ে হোক এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে একমাত্র অপুষ্টি পীড়িত শিশুরাই এতে আক্রান্ত হচ্ছেন এবং শয়ে শয়ে মারা যাচ্ছেন। অথচ এই লিচু সারা দেশের লোক খাচ্ছে, বিদেশের লোক খাচ্ছে, বিহার-উত্তরপ্রদেশের ধনী পরিবারের শিশুরাও খাচ্ছে। কিন্তু আক্রান্ত হচ্ছে অনাহার অপুষ্টিতে ভোগা শিশুরাই শুধু। সুতরাং **অনাহার বা অপুষ্টিই যে এই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এই সত্য আমাদের সামনে বার বার উঠে আসছে।**

শুধু তাই নয়, যে পরিস্থিতিতে চিকিৎসা চলছে তা ভয়াবহ। একজন ডাক্তারের অধীন ৪টি ICU, এখানে রোগীর সংখ্যা ১৫০, নার্স নেই, অক্সিজেন, পর্যাপ্ত ওষুধ নেই।

বিহারে সরকারি হাসপাতালে ৭০ শতাংশ ডাক্তারের পদ খালি। পর্যাপ্ত নার্স বা স্বাস্থ্যকর্মী নেই। ICU, ভেন্টিলেশন এর পরিষেবাও যথাযথ নেই। ২০১৪ সালে মজফফ্‌রপুরে শতাধিক শিশুমৃত্যুর পর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ হর্ষবর্ধন আশ্বাস দিয়েছিলেন ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট আধুনিক হাসপাতাল হবে, গবেষণার জন্য ল্যাবরেটরী হবে। ৫ বছর পরে এসে তিনি আবার পুরানো প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরে গেলেন!

এই পরিস্থিতির সার্বিক সমাধানের লক্ষ্যে একটি জনসংগঠন, জনবাদী লোকমঞ্চ (কাটিহার) তাদের দ্বারা প্রচারিত প্রচারপত্রে দাবি রেখেছে –

১। অপুষ্টি দূর করার জন্য সরকারি স্কুলে, অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর আহার দিতে হবে। মেহনতী জনতার পর্যাপ্ত পুষ্টিকর আহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

২। সকলের জন্য স্বাস্থ্য সুবিধার দায় সরকারকে নিতে হবে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ নীতি বাতিল কর। স্বাস্থ্যকে এক সামাজিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

৩। সরকারি হাসপাতালে পর্যাপ্ত সংখ্যায় ডাক্তার এবং স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগ করতে হবে।

৪। জনস্বাস্থ্য, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, জনকল্যাণকারী গবেষণা ইত্যাদি জনমুখী খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

৫। মৃত বাচ্চাদের পরিবারকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং অসুস্থ বাচ্চাদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে ২০১৭ সালে গোরক্ষপুরের বি আর ডি হাসপাতালের শিশু বিশেষজ্ঞ ডঃ কাফিল খানের প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ। সেসময় ওই হাসপাতালে শত শত AES আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে অক্সিজেনের অভাব থাকায়, বাইরে থেকে অক্সিজেন এনে চিকিৎসা করার অভিযোগে ডঃ কাফিল খানকে সরকার গ্রেফতার করে ৯ মাস জেলে আটক রাখে এবং নানাভাবে নিগ্রহ করে।

গত ২৪শে জুলাই ২০১৯ ডঃ কাফিল খান কলকাতায়

অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানের ভাষণে সেই ঘটনা তুলে ধরেন। এর সংক্ষিপ্ত অংশ প্রকাশ করা হচ্ছে।

"৫৬ ঘন্টা ধরে হাসপাতালে কোন তরল অক্সিজেন ছিল না। এমনকি জরুরিকালীন প্রয়োজনে ব্যবহৃত সিলিন্ডারগুলিও ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। ওই ৫৬ ঘন্টা আমার কাছে যতটা ভয়াবহ ছিল তা জেলে কাটানো ৯ মাসের তুলনায় অনেক বেশি। আমি রাতে হাসপাতালের সকল গুরুত্বপূর্ণ কর্মীদের ডেকে পাঠালাম। ... শুধু আমি নই, জুনিয়র ডাক্তার, ওয়ার্ড বয়, সুইপার, নার্স সকলে একটা টীম হিসাবে কাজ করে শহরের সব জায়গা থেকে তরল অক্সিজেন সংগ্রহ করে খালি সিলিন্ডারগুলি ভর্তি করেছিলাম। আমরা সত্যই এই যুদ্ধে জিততে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমরা সব মৃত্যুকে থামাতে পারি নি। এরপর যখনই যোগী আদিত্যনাথ (উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী) হাসপাতালে এলেন, তিনি এসেই আমায় ডেকে পাঠালেন। যখন আমি তার সাথে দেখা করলাম, তিনি বললেন, "তো তুই হলি ডাক্তার কাফিল? নিজেকে তো বহুত হিরো মনে করিস? আমি তোকে দেখছি।" এই চারটি বাক্যের দ্বারা উনি আমার জীবন চিরদিনের জন্য বদলে দিলেন।"...

"যখন এনসেফালাইটিস ছড়িয়ে পড়ছিল যোগী বললেন, এটা ঘটছে 'রহস্যজনক অসুখ' এর কারণে। আমি বলেছিলাম, চিকিৎসা জগতে 'রহস্যজনক' বলে কিছু হতে পারে না। আমি খুঁজে বার করি যে, এটা এনসেফালাইটিস এর কারণে হচ্ছে। আমি নিজে এই সত্য একটা প্রেস কনফারেন্স করে জানাতে যাই। সেখানে একটি পুলিশ ভ্যান এসে বলে বি আর ডি হাসপাতালের দুঃখজনক পরিণতির কথা বলা বন্ধ করুন। আমি বলি আমি তা পারব না। তারা আমাকে আবারও একমাসের জন্য জেলে নিয়ে যায়।"...

"মোদি সরকারের কাছে স্বাস্থ্য নিয়ে তথ্য চাইলে তারা আমাদের কোন তথ্য দেয় না। তাই ১২ জন স্বাস্থ্য নিয়ে সক্রিয় কর্মী সারা দেশ জুড়ে তথ্য সংগ্রহ করেন – 'সকলের জন্য স্বাস্থ্যের দাবিতে'। ভারতে স্বাস্থ্যখাতে GDP-র মাত্র ১.৩% জনস্বাস্থ্যে ব্যয় হয়। এটা বিভিন্ন দেশের মধ্যে নিম্নতম। দেশের ৮০% ডাক্তাররাই প্রাইভেট হাসপাতালে কাজ করে দেশের মাত্র ২৭% জনতাকে সেবা করছেন। দেশে যত মৃত্যু হয় তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাঁচানো সম্ভব। দলিত, আদিবাসি, সংখ্যালঘু এবং মহিলারাই এই স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় ভয়ঙ্কর অবস্থায় আছেন এবং সবথেকে কম চিকিৎসার সুযোগ পান।"

সুতরাং বিহারের শিশুমৃত্যু কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এদেশে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে রয়েছে এক চরম অসমতা। মুষ্টিমেয় ধনীর জন্য রয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক সেবা কেনার অবাধ সুযোগ আর দরিদ্র, নিঃস্ব শ্রমজীবী জনতার জন্য ছিঁটেফোটা! সুতরাং বিজ্ঞানের প্রয়োগকে জনস্বার্থে ব্যবহারের জন্য, সরকারি হাসপাতালের অবস্থার আমূল পরিবর্তন করে এই মৃত্যু মিছিল ঠেকাতে হলে 'স্বাস্থ্য একটি সামাজিক অধিকার' এই দাবিতে ঐক্যবদ্ধ লড়াই প্রয়োজন।■

কে আমাদের বাবা? আমাদের মা-ই বা কে?

গত ১৯শে জুলাই সংসদে মানবাধিকার রক্ষা (সংশোধনী) বিল ২০১৯ নিয়ে আলোচনা এক উৎসাহব্যঞ্জক দিকে মোড় নেয়। শাসকদল বিজেপি'র সাংসদ সত্যপাল সিং আলোচনায় অংশ নিয়ে 'মানবাধিকার'কে পশ্চিমী সংস্কৃতির বিদেশী ধারণা বলে অভিহিত করেন এবং বলেন সংবিধান প্রণেতারা 'মৌলিক অধিকার' প্রসঙ্গে আমেরিকার সংবিধান দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

একটা বহুল প্রচলিত চুটকি হল এই যে একজন ছাত্র কেবল 'গরু' রচনা প্রস্তুত করে পরীক্ষায় বসেছিল। প্রশ্ন পত্রে 'নদী' সম্পর্কে রচনা লিখতে বলা হলে সে লিখলো – নদীতে জল বয়ে যায়, নদীর পারে ঘাস হয়, সেই ঘাস খেতে গরু আসে। অতঃপর গরুর রচনা। ঠিক তেমনি সিংহ মহাশয় চার্লস ডারউইনের বিরোধিতা করার জন্য নিবেদিত। মানব সম্পদ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রীরূপে আগেই তিনি বলেছিলেন যে আমরা বাঁদর (Monkey) থেকে জন্মাইনি, আমাদের কোন পূর্বপুরুষ লিখিত বা মৌখিকভাবে বলে যাননি যে 'Ape' থেকে মানুষ হতে দেখা গেছে। সুতরাং ডারউইনের বিবর্তনবাদ মিথ্যে। একে স্কুল কলেজ পাঠক্রম থেকে হঠিয়ে দিতে হবে।

বর্তমান সংসদে ক্ষমতার জোরে সিংহ বাবু আরো আত্মবিশ্বাসী হয়েছেন। তিনি মানবাধিকার 'বিদেশী ধারণা' আর ডারউইনের বিবর্তনবাদও বিদেশী এই যুক্তি রাখেন। তিনি বলেন, "আমাদের সংস্কৃতি বলে আমরা ঋষির সন্তান, যারা মনে করেন আমরা বাঁদরের সন্তান আমি তাদের রুষ্ট করতে চাই না।"

এর উত্তরে DMK (দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজঘাম) সাংসদ কানিমোজি স্মিতহাস্যে বলেন "দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার পূর্বপুরুষরা ঋষি ছিলেন না। আমার পূর্বপুরুষ হোমো সেপিয়েন্স আর আমার পিতা-মাতা শুদ্র ছিলেন। তাঁরা কোন ভগবান বা ভগবানের অংশ থেকে জন্ম নেননি।"■

বিশেষ রচনা ঃ

ভারত কী তীব্র জলসঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে?

ভূমিকা ঃ সম্প্রতি সারা দেশে জলসঙ্কট নিয়ে ভারত সরকারের নীতি আয়োগের একটি রিপোর্ট নিয়ে জোরদার আলোচনা শুরু হয়েছে। ২০১৮ সালের জুন মাসে এই রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই রিপোর্টে বলা হয় ভারত বর্তমানে ভয়ঙ্কর এক জলসঙ্কটের সম্মুখীন, যা এদেশে ইতিপূর্বে আর কখনও দেখা যায় নি। এই মুহূর্তে প্রায় ৬০ কোটি ভারতীয় তীব্র জলসঙ্কটে আছেন এবং নিরাপদ পানীয় জলের অভাবে প্রতিবছর ২ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছেন। ২০৩০ সালে এই সঙ্কট ভয়াবহরূপ নিয়ে চাহিদা ছাপিয়ে যাবে যোগানকে। ২০৫০ সাল নাগাদ জলের অভাবে উৎপাদন এতটাই মার খাবে যে জাতীয় আয়ের পরিমাণ কমে যাবে প্রায় ৬ শতাংশ।

এত দূরের কথা নয়, নীতি আয়োগের ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে ২০২০ সালে অর্থাৎ আগামী এক বছরের মধ্যে ভারতের একুশটি শহর যেমন দিল্লী, বেঙ্গালুরু, মেরঠ, ফরিদাবাদ, গুরগাঁও, হায়দরাবাদ, চেন্নাই, কোয়েম্বত্তুর, বিজয়ওয়াড়া, অমরাবতী, শোলাপুর, শিমলা, কোচি, নাগপুর, ভোপাল, উজ্জয়িনী, ইন্দোর, ঔরঙ্গাবাদ ইত্যাদি শহরে ভূগর্ভস্থ পানীয় জলের ভান্ডার কার্যত নিঃশেষ হয়ে যাবে।

নীতি আয়োগের গত একবছর আগেকার রিপোর্ট নিয়ে এত শোরগোলের কারণ ভারত সরকারের নতুন জলসম্পদ মন্ত্রক, 'জলশক্তি মন্ত্রক' নাম নিয়ে ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ 'জলশক্তি অভিযান' শুরু করেছে। প্রধানমন্ত্রী গত ৩০শে জুন ২০১৯ 'মন কি বাত' নামক জাতির উদ্দেশ্যে বেতারের অনুষ্ঠানে আসন্ন সঙ্কট মোকাবিলায় সরকার কি করতে চলেছে এবং জনসাধারণের কর্তব্য কী তা প্রচার করে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেন। সংবাদপত্র, টিভি, সোস্যাল মিডিয়া, সরকার এবং এন জি ও-দের প্রচারে দেশের মানুষের মধ্যে বর্তমানে মুখ্য আলোচনার বিষয় হল জলসঙ্কট!

জলশক্তি অভিযান ঃ পূর্ব প্রতিশ্রুতিমতই কেন্দ্রের জলশক্তি মন্ত্রক 'জলশক্তি অভিযান'-এ নেমেছে। এই অভিযানে দেশের ২৫৫টি জলশক্তিতে পিছিয়ে থাকা জেলায় আড়াই মাস ধরে গ্রামীণ কৃষকদের বৃষ্টির জল ধরে চাষের কথা এবং জলসংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বোঝান হবে। জলাশয়গুলিকে সংস্কার করা হবে। ভূগর্ভে জল পাঠানোর জন্য যেসব কূপ ইত্যাদি অতীতে খনন করা হয়েছিল সেগুলি সংস্কার

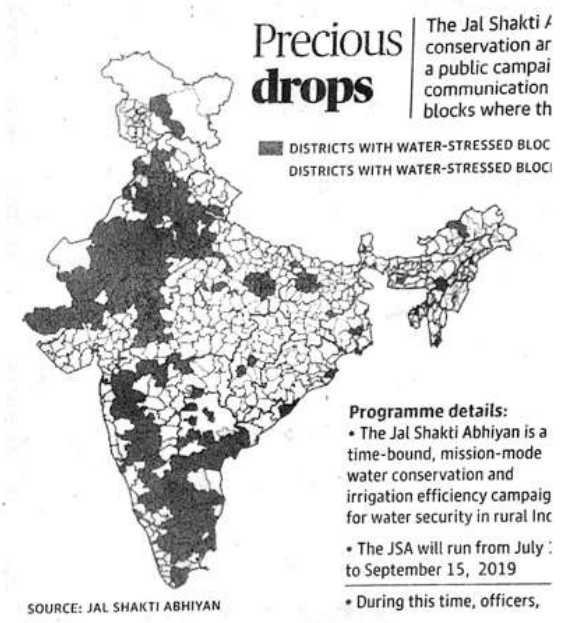

চিত্র ১ ঃ জলশক্তি অভিযানের মানচিত্র

করা হবে। জলবিভাজিকা বা ওয়াটার শেড এর বিকাশ ঘটানো হবে। দেশব্যাপী এবং ব্যাপকহারে বৃক্ষরোপণের কর্মসূচী নেওয়া হবে। এই কাজে বিভিন্ন মন্ত্রকের ২৫৫ জন যুগ্ম এবং অতিরিক্ত যুগ্ম সেক্রেটারি, ৫৫০ জন ডেপুটি সেক্রেটারি স্তরের অফিসার এবং বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীরা সামিল হবেন। অর্থাৎ এক বিরাট কর্মযজ্ঞ হতে চলেছে। কিন্তু এর ফল কি ফলবে তা ভবিষ্যৎই বলবে! (চিত্র ১ ঃ জলশক্তি অভিযানের মানচিত্র)

জলাভাবের বর্তমান চিত্র ঃ গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জলাভাব দেখা দিয়েছে। দক্ষিণ ভারতের চেন্নাই, হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরু, মহারাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ অঞ্চল, কর্ণাটক, রাজস্থান, উত্তর-পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, হরিয়ানাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বোতল ভর্ত্তি জল নিয়ে কালোবাজারি হচ্ছে। ট্রেনে করে জলসরবরাহ করা হচ্ছে। জল সংগ্রহের জন্য মানুষকে দূর-দুরান্ত যেতে হচ্ছে। 'জলশক্তি অভিযান' এর তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বা রাজধানী কলকাতা না থাকলেও রাজ্যের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামের কিছু অঞ্চল, উত্তর দিনাজপুর

জেলার কালিয়াগঞ্জের মুস্তাফানগর, ধবাইল, সাহাপুর, মালগাঁওসহ বিভিন্ন গ্রামগুলিতে জলাভাব দেখা দিয়েছে। কলকাতা মেট্রোপলিটান শহরের জলস্তর বিগত ৩০ বছরে ৫-১৬ মিটার নেমে গেছে। দক্ষিণ কলকাতার বাঁশদ্রোনী সংলগ্ন এলাকায় ৯-১১ মিটার; গড়িয়া অঞ্চলে ৮-১০ মিটার; বাগুইআটি, দমদম ও বেহালায় ১০-১২ মিটার; আলিপুর, বাবুঘাট, পার্কসার্কাস, বালিগঞ্জ অঞ্চলে ১৫ মিটার; ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন অঞ্চলে ১২-১৮ মিটার জলস্তর নেমে গেছে। (তথ্যসূত্র ঃ সাপ্তাহিক বর্তমান ২০শে জুলাই ২০১৯) এ প্রসঙ্গে বলা দরকার যে ভূগর্ভস্থ জলস্তর সাধারণতঃ বছরে দুইবার মাপা হয় – বর্ষার আগে এবং বর্ষার পরে। বর্ষার আগে জলস্তর সর্বাধিক নেমে যায় এবং বর্ষার শেষে সর্বাধিক উপরে উঠে আসে। জলস্তর নেমে যাওয়ার এই রিপোর্ট যা সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হচ্ছে তার স্পষ্ট ভিত্তি কিন্তু জানা যায় না। কোন সময় এই জলস্তর মাপা হয়েছে তা জানলে বিষয়টি বোঝা সম্ভব, নতুবা নয়।

দেশের বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যসরকার কৃষকদের বিদ্যুৎ এবং ডিজেলে যে ভর্তুকি দেয় তা প্রত্যাহার করতে হবে। পৌরসভাগুলিতে জলসরবরাহে মিটার বসিয়ে ওয়াটার ট্যাক্স আদায় করতে হবে এবং জলের সরবরাহ কমাতে হবে, জলের র‍্যাশনিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে। কৃষকদের বৃষ্টির জল ধরে একমাত্র তার দ্বারাই কৃষিকাজে শিক্ষিত করতে হবে। উচ্চফলনশীল শস্য চাষ বন্ধ করতে হবে এবং তার বদলে চিরায়ত বীজ ব্যবহারের অভ্যাসে ফিরে যেতে হবে

এই জলাভাবের জন্য কাদের দায়ী করা হচ্ছে?

খোদ সরকার থেকে শুরু করে, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা, নানান প্রিন্ট এবং টেলিমিডিয়া, তথাকথিত বিদ্বজন এবং পরিবেশবাদীরা এই জলাভাবের জন্য মুখ্যত সাধারণ মানুষ দ্বারা জলের অপচয়, আধুনিক উচ্চফলনশীল বীজ চাষের জন্য কৃষকদের দ্বারা ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন, সেচ ব্যবস্থা, মনুষ্যসৃষ্ট বিশ্ব উষ্ণায়ন, জনসংখ্যাবৃদ্ধি, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার দ্বারা জলদূষণ, জঙ্গল তথা বনাঞ্চলে গাছ কাটা এবং অপরিকল্পিত নগরায়ণকে দায়ী করা হচ্ছে। প্রস্তাব এসেছে ভূগর্ভস্থ জলের প্রায় ৬০-৭০ শতাংশই যেহেতু কৃষিকাজে ব্যবহৃত হয় তাই কৃষিকাজে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যসরকার কৃষকদের বিদ্যুৎ এবং ডিজেলে যে ভর্তুকি দেয় তা প্রত্যাহার করতে হবে। পৌরসভাগুলিতে জলসরবরাহে মিটার বসিয়ে ওয়াটার ট্যাক্স আদায় করতে হবে এবং জলের সরবরাহ কমাতে হবে, জলের র‍্যাশনিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে। কৃষকদের বৃষ্টির জল ধরে একমাত্র তার দ্বারাই কৃষিকাজে শিক্ষিত করতে হবে। উচ্চফলনশীল শস্য চাষ বন্ধ করতে হবে এবং তার বদলে চিরায়ত বীজ ব্যবহারের অভ্যাসে ফিরে যেতে হবে এবং ড্রাইল্যান্ড ফার্মিং (কম জল লাগে এমন ফসল চাষ) করতে হবে ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট পরিবেশবিদ শ্রীমতী জয়া মিত্র গত ৯ই জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকার উত্তর সম্পাদকীয়তে **'এই সুজলা দেশভূমির এমন অ-প্রাকৃতিক অবস্থা হল কী করে – প্রশ্ন করতে বাধ্য হচ্ছি'** শীর্ষক রচনাটি প্রণিধানযোগ্য। বর্তমান জলসঙ্কটের নামে শোরগোলের মাঝে শ্রীমতী মিত্র প্রাচীন প্রকৃতি নির্ভর কৃষি উৎপাদন এবং স্বশাসিত গ্রাম সমাজ ব্যবস্থার পুনস্থাপনার ওকালতি করেছেন। তিনি লিখেছেন, "গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস বাদ দিলে, নদী-পুকুরের জলেই ভারতের লোকজন নিজেদের সব কাজ অকাজ মেটাতো ... মাত্র পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যে এই সুজলা দেশভূমির এমন 'অ-প্রাকৃতিক' অবস্থা কী করে ঘটতে পারে, সেটা খতিয়ে দেখে কোথা দিয়ে ভূ-জল হু হু করে বেড়িয়ে যাচ্ছে, সেই গর্তগুলোকে বন্ধ করাই কি আজ রক্ষা পাওয়ার অন্যতম পথ নয়? ..."

"আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ভূ-জল খরচ হয় কৃষিতে। এও জানি যে, অবস্থাটা পঞ্চাশ বছর আগে এরকম ছিল না। ষাটের দশকের শেষ থেকে প্রায় জোর করে যখন এই ছ'হাজার বছরের প্রাচীন কৃষিসমৃদ্ধ দেশে হাইব্রিড ধান-গমের চাষ শুরু করা হল, তখন থেকেই এই সঙ্কটের গোড়াপত্তন।"

আধুনিক সমাজের বদলে প্রাচীন স্বশাসিত গ্রাম সমাজ ফিরিয়ে আনার স্বপক্ষে ওকালতি করে তিনি লিখেছেন "স্থানিক উৎপাদন ও স্থানিক বেচাকেনার ব্যবস্থা যতদিন প্রচলিত ছিল, গ্রামের মানুষ, যারা সর্বদাই প্রচুর সংখ্যাগরিষ্ঠ, নিজেদের এলাকায় সহজপ্রাপ্য প্রাকৃতিক বীজ ও উদ্ভিদের চাষ করেছে জীবনধারণের জন্য। ফলে, খরা ও খাদ্যাভাবের সময়ও

আদিবাসী বা প্রান্তিক এলাকার দরিদ্র মানুষদের মধ্যে অনাহারে মৃত্যু কম ছিল শহর কিংবা শহরঘেঁষা গ্রামের দরিদ্রদের চেয়ে। এই অবস্থা বদলাতে থাকে যখন দেশ ঔপনিবেশিক শাসনের কবলে পড়ে।"

শ্রীমতী মিত্র গ্রামে গ্রামে পানীয় জল বিতরণের ব্যবস্থার বিরোধিতায় লিখেছেন "বরং 'গ্রামে গ্রামে পানীয় জল' দেওয়ার সদিচ্ছায় একটি সুস্থায়ী প্রাচীন সক্ষম জলসংরক্ষণ ব্যবস্থাকে তছনছ করে ফেলা হয়।"

অধিক ফলনশীল এবং অপ্রাকৃতিক সংকর বীজ চাষের কুফল নিয়ে তিনি লিখেছেন "সেচের জন্য তৈরি হল বাঁধের পর বাঁধ, কাটা হল হাজার হাজার মাইল দীর্ঘ সেচখাল। সেগুলো বিফলে গেল, পরে রইল অসংখ্য মরা নদীর সোঁতা। তারপর মাঠে নামল লক্ষ লক্ষ পাম্প। কোটি বছরের জন্য পৃথিবীর নিজস্ব জলভান্ডার তুলে গড়িয়ে দেওয়া হতে লাগল মাঠে।"

আধুনিক কৃষি কিভাবে ভূগর্ভস্থ জলকে বিদেশে পাচার করছে তার উদাহরণ দিতে গিয়ে বর্তমান বিশ্বে ধান রপ্তানিতে বিশ্বের দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দেশের প্রসঙ্গে শ্রীমতী মিত্র লিখেছেন "এক

বিশ্বের বাজারে বোতলে ভরা জল রপ্তানিতে ভারত বর্তমানে তৃতীয় স্থানাধিকারী। পৃথিবীর মোট বোতলবন্দি জল রপ্তানির ১২ শতাংশই হয় ভারত থেকে।

কে জি হাইব্রিড চাল তৈরিতে ২০০০-৩০০০ লিটার জল লাগে, তা হলে 'দ্বিতীয় সর্বাধিক' চালের সঙ্গে কত পরিমাণ ভূমিজল এদেশের ভূমিতল ছেড়ে বিদেশে যাচ্ছে?"

জলসঙ্কট নিয়ে অনেক জ্ঞানগর্ভ, পান্ডিত্যপূর্ণ মন্তব্য করে, দেশে পুণরায় স্বশাসিত গ্রাম সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার ওকালতি করলেও শ্রীমতী মিত্র নগরায়ণ, শিল্পায়ণ এবং বিশাল অট্টালিকার পত্তন ভূগর্ভস্থ জলের ভান্ডারে কি প্রভাব ফেলছে সে প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন। সচেতনভাবে এড়িয়ে গেছেন যার অপর নাম জীবন সেই জলকে নিয়ে সরকারি বেসরকারি বিরাট জলের ব্যবসার প্রসঙ্গ। এড়িয়ে গেছেন সমুদ্রের নোনা জল পরিশ্রুত করে সরবরাহের প্রসঙ্গ। সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধানের পথ সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে দীর্ঘ মনগড়া উক্তির পর তিনি সমস্যা থেকে পলায়নের পথ ধরেছেন। তিনি লিখেছেন "মাটির ওপরের মত ভূতলগত জলও স্রোতে চলে, তা শহরের নীচে ও মাঠের নীচে স্থির নয়। শহরে হাজার হাজার

দেশে এই মুহূর্তে ৭৪২৬টি লাইসেন্স প্রাপ্ত জল বোতলবন্দি করার কারখানা আছে নানা দেশী-বিদেশী এবং সরকারি কোম্পানীর। লাইসেন্সহীন কারখানার সংখ্যা অগুন্তি।

বহুতল তুললে, গ্রামের ক্ষেত অথবা মাঠের ভূ-জল তুলতে থাকলে শহর আলাদা করে বিপন্ন হবে এমন নয়।

এই একটি বিদ্যাও আমার অধিগত নয়, আমার অধিকার নেই এসব বিষয়ে কথা বলার।"

সমাজবিজ্ঞানকে এড়িয়ে, প্রকৃতিবিজ্ঞানকে নিজের খেয়ালখুশিমত ব্যাখ্যা করে শ্রীমতী জয়া মিত্র তাই বিজ্ঞান নয় অপবিজ্ঞানেরই প্রচার করেছেন। আর 'এই একটি বিদ্যাও আমার অধিগত নয়' বলে প্রসঙ্গ থেকে পলায়ন কি বিজ্ঞান মনস্কতার পরিচয়? যে বিদ্যা তাঁর অধিগত নয় সেই বিদ্যাচর্চা করে জনমত সৃষ্টি করার অধিকার আনন্দবাজার দিতে পারে, কোন বিজ্ঞান মনস্ক, সমাজ সচেতন মানুষ দিতে পারে কী?

জল নিয়ে ব্যবসায় ভারত প্রথম সারিতে ঃ রাষ্ট্রপুঞ্জ দ্বারা প্রকাশিত তথ্য অনুসারে ভারতে প্রায় ১৭ কোটি মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত। প্রতিবছর পানীয় জলের সমস্যায় মারা যান প্রায় ২ লক্ষ মানুষ। অথচ বিশ্বের বাজারে বোতলে ভরা জল রপ্তানিতে ভারত বর্তমানে তৃতীয় স্থানাধিকারী। জলদূষণ, জলসঙ্কটের ব্যাপক প্রচার বিগত ৩ দশকে এদেশে এক বিরাট বোতলবন্দি পানীয় জলের বাজার সৃষ্টি করেছে। শহরগুলির প্রাণকেন্দ্রে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহকে কার্যতঃ অকেজো করে রাখা হয়েছে। রেল স্টেশন, বাসস্টপ, এয়ারপোর্ট, রাস্তার মোড় এবং বসতি বা বাণিজ্যকেন্দ্রে সরকারি পানীয় জলের ব্যবস্থা প্রায় উঠে যাওয়ার মুখে এবং যা জল আছে তা দূষিত এই প্রচার নিম্নবিত্ত মানুষদেরও বোতলে ভরা জল কিনতে কার্যতঃ বাধ্য করছে। দেশে এই মুহূর্তে ৭৪২৬টি লাইসেন্স প্রাপ্ত জল বোতলবন্দি করার কারখানা আছে নানা দেশী-বিদেশী এবং সরকারি কোম্পানীর। লাইসেন্সহীন কারখানার সংখ্যা অগুন্তি। ল্যাবরেটরির পরীক্ষায় নামী-অনামী কোম্পানীগুলির বোতলবন্দি জল ও ঠান্ডা পাণীয়ের অধিকাংশই যে দূষিত তা প্রমাণ হলেও এই ব্যবসা রমরম করে বেড়ে চলেছে। দেশের বিস্তীর্ণ প্রান্তের নদী, জলাধার, ঝর্ণা এবং ভূগর্ভস্থ জলকে এইসব কোম্পানি ইচ্ছাখুশীমত ব্যবহার করছে বা বলা যায় কার্যত দখল নিয়েছে। এই নিয়ে কারও মুখে কোন রা নেই। বর্তমানে দেশে বোতলবন্দি জলের উপর সম্পূর্ণ

নির্ভরশীল প্রায় সাড়ে সাত কোটি মানুষ। বছরের কোন না কোন সময় বোতলের জল কিনে ব্যবহার করতে বাধ্য হন এর কয়েকগুণ। পৃথিবীর মোট বোতলবন্দি জল রপ্তানির ১২ শতাংশই হয় ভারত থেকে। (তথ্যসূত্র ঃ সাপ্তাহিক বর্তমান ২০/৭/১৯)

জলসঙ্কট নিয়ে নীতি আয়োগের রিপোর্ট জল মেশানো ?

দেশের বিভিন্ন অংশে জলাভাবের চিত্রকে সামনে রেখে জলসঙ্কটের আশঙ্কা নিয়ে দেশব্যাপী শোরগোল যে রিপোর্টকে ভিত্তি করে চলছে সেই ভারত সরকারের নীতি আয়োগের রিপোর্টটি প্রথমে একটু বিচার করা যাক।

গত জুন ২০১৮, ভারত সরকারের নীতি আয়োগ এক রিপোর্টে জানিয়েছিল যে ২০২০ সালের মধ্যে দেশের দিল্লী, চেন্নাই, হায়দরাবাদ, বেঙ্গালুরুসহ ২১টি বড় শহরের ভূগর্ভস্থ জল প্রায় শূন্য হয়ে যাবে। এর ফলে দেশের ১০ কোটি মানুষ তীব্র জলসঙ্কটে পড়বেন। আনন্দবাজার পত্রিকার গত ৩০শে জুন সংখ্যায় **'নীতি আয়োগের জলের রিপোর্ট জল মেশানো'** শীর্ষক রিপোর্টে লিখেছে "এক মার্কিন সংবাদপত্রের সাংবাদিকের দাবি অনুযায়ী, গত জুনে প্রকাশিত ওই রিপোর্টে নীতি আয়োগ তথ্যসূত্র হিসাবে বিশ্ব ব্যাঙ্ক, ওয়ার্ল্ড রিসোর্সেস ইনস্টিটিউট এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রের রিপোর্টকে তুলে ধরেছে। কিন্তু বিশ্ব ব্যাঙ্ক বা ওয়ার্ল্ড রিসোর্সেস ইনস্টিটিউট কারও দেওয়া তথ্যেই এক বছরের মধ্যে জল শেষ হয়ে যাওয়ার কথা বলা নেই! এ নিয়ে খোঁজখবর করলে নীতি আয়োগ জানায়, ওই তথ্য মিলেছে কেন্দ্রীয় জল সম্পদ মন্ত্রকের অধীন ভূগর্ভস্থ জল পর্ষদ (সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ড) থেকে। কিন্তু ভূগর্ভস্থ জলপর্ষদ জানিয়েছে, তাদের কাছে ঠিক এরকম কোনও তথ্য নেই!

ফলে সংশয় বাড়ছে। দেখা যাচ্ছে, নীতি আয়োগ ভূগর্ভস্থ জলপর্ষদের যে রিপোর্টের সাহায্য নিয়েছে, তা আসলে ২০১৩-র ২০টি জেলা শহরের ভূগর্ভস্থ জল নিয়ে রিপোর্ট। এই ২০টি জেলা শহরের মধ্যে ১২টি গুরুত্বপূর্ণ শহরও আছে। সে সময় পর্ষদ জানিয়েছিল, এই শহরগুলিতে যে পরিমাণ ভূগর্ভস্থ জল তুলে নেওয়া হচ্ছে, সেই পরিমাণ জল মাটির তলায় জমছে না।

বিশেষজ্ঞদের প্রশ্ন, পর্ষদের ওই রিপোর্ট থেকে কীভাবে বলা হল, ২০২০-তে জল ফুরিয়ে যাবে? তাছাড়া পর্ষদের রিপোর্টে মাটির উপরের জল, যেমন পুকুর,হ্রদ, জলাধারগুলিকে হিসেবের মধ্যে ধরা হয় নি। চেন্নাইয়ের মতো শহরে জলের সমস্যা যে রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। সমস্যা ঠিক মত না বোঝানো গেলে, সমাধানের পথ বাছতেও ভুল হতে পারে।"

অর্থাৎ সরষের মধ্যেই ভূত! জলসঙ্কট নিয়ে যে রিপোর্টের ভিত্তিতে এত শোরগোল সেই রিপোর্টেই জল!

অতএব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জলাভাবের দরুন যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে সরকার, প্রচার মাধ্যম এবং পরিবেশবাদীরা জনমানসে যে ধোঁয়াশা ও বিভ্রম সৃষ্টি করে চলেছে তাকে স্পষ্টরূপে বুঝতে আমাদের বিষয়টির গভীরে যাওয়া প্রয়োজন। যে কোন সমস্যার বস্তুনিষ্ঠ, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণই সমাধানের রাস্তা দেখাতে পারে। সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞান ভিন্ন অন্য পথ নেই। এই কারণে আমাদের প্রথমে **জলবিদ্যা** বা **হাইড্রোলজি** (hydrology) সম্পর্কে সাধারণ ধারণার প্রয়োজন।

জলবিদ্যা বা হাইড্রোলজি

বিজ্ঞানীরা সকলেই এ বিষয়ে একমত যে পৃথিবী সৃষ্টির সময়কালে অর্থাৎ আজ থেকে অন্ততঃ ৪৬০ কোটি বছর আগে উত্তপ্ত জ্বলন্ত পৃথিবীতে জলের (free water) অস্তিত্ব ছিল না। তাই তখন পৃথিবীতে মহাদেশ বা সমুদ্র বলতে আলাদা কিছু ছিল না। পৃথিবী ধীরে ধীরে ঠান্ডা হওয়ার পর, আজ থেকে অন্ততঃ ৪২০-৪০০ কোটি বছর আগে মহাকাশ থেকে নানা উল্কাপাত, পৃথিবীর বুকে ঘটা নানা অগ্নুৎপাত এবং নানা ভূ-রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পৃথিবীতে জলের সৃষ্টি হয়। সাগর এবং মহাদেশীয় ভূখন্ড পৃথক হয়। এই সাগর ও মহাদেশীয় ভূখন্ডের ক্রমবিবর্তন চলতে থাকে, যা আজও বজায় আছে। সময়অন্তরে নানা ভূখন্ড এবং সাগর-উপসাগরের জন্ম হচ্ছে, পুরানো মহাদেশের রূপ বদলাচ্ছে, বহু সাগরের অবলুপ্তি ঘটছে। এই সাগরের জলেই প্রথম প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে। নানা ধারাবাহিক এবং পর্যায়ক্রমিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের নীচের স্তর থেকে ভূত্বকের উপরিস্তরে (সাগর এবং মহাদেশ) জল কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় অবস্থায় রয়েছে। একে বলে **হাইড্রোস্ফিয়ার**। (চিত্র-২)

আমরা জানি যে পৃথিবীর ৩ ভাগ জল, ১ ভাগ স্থল। পৃথিবীর মোট জলের প্রায় ৯৭ শতাংশই আছে সমুদ্রে নোনা জল হিসেবে। আর মাত্র ৩ শতাংশ লবণমুক্ত মিষ্টি জল আছে সুউচ্চ পবর্তমালা এবং মেরু অঞ্চলের বরফ বা হিমবাহরূপে। বাকি অংশ নদীপ্রবাহ, প্রাকৃতিক হ্রদ, জলাভূমি, মানুষের দ্বারা সৃষ্ট খাল, বিল, পুকুরে এবং ভূগর্ভে আছে। মিষ্টি জলের প্রায় ৭০-৭৫ শতাংশ আছে সুউচ্চ পর্বতমালা ও মেরু অঞ্চলে বরফ বা হিমবাহরূপে, বাকি ২৫-৩০ শতাংশ আছে ভূপৃষ্ঠের নদী-হ্রদ-

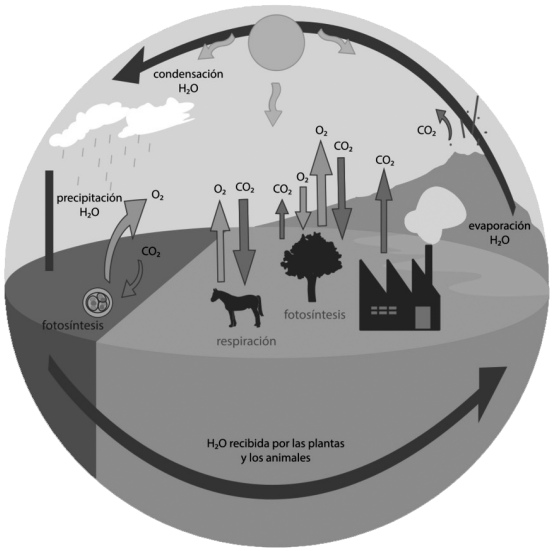

চিত্র ২ ঃ হাইড্রোস্ফিয়ার

খাল-বিল-জলাশয় এবং ভূগর্ভে। বায়ুমন্ডলে জলীয় বাষ্প মেঘের আকারে রয়েছে। বিস্তীর্ণ সমুদ্রের জল (এবং নদী বা জলাশয়ের জল) সূর্যালোকের তাপে জলীয় বাষ্প হয়ে মেঘ সৃষ্টি করে। সেই মেঘ থেকে জলধারা হিসাবে বৃষ্টিপাত এবং তুষারপাত হয় মহাদেশ এবং সাগরে। সমুদ্রের লবণাক্ত জল বাষ্পায়ণের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় মিষ্টি জলরূপে মহাদেশ ও সাগরে পড়ে। মহাদেশে এই বৃষ্টির মিষ্টি জল নদী-নালা দিয়ে বা ভূপৃষ্ঠ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সাগরে যেমন পড়ে তেমনই তার একাংশ হ্রদ-নদী, জলাশয়ে সঞ্চিত হয় এবং অপরাংশ ভূত্বক দ্বারা শোষিত হয়ে ভূগর্ভে সঞ্চিত হয়। ভূগর্ভের সঞ্চিত জলও কিন্তু প্রবাহমান। ভূগর্ভের জল ভূত্বকের মাটি, বালি, নুড়ি, পাথরের মধ্যে যাওয়ার পর মাটির নীচের জলধারণ ও পরিবহন করার মত স্তরে যেমন বালি ও নুড়ি মিশ্রিত মাটি, বালি, বেলে পাথর, নুড়ি পাথর, ফাটল ও ছিদ্রে ভর্ত্তি অন্যান্য পাথরে সঞ্চিত থেকে প্রবাহিত হয়। এগুলিকে **অ্যাকুইফার** বা জল পরিবাহক স্তর বলে। জল পরিবহণে অক্ষম মাটি (কাদা মাটি), কাদা পাথর, ফাটল বা ছিদ্রহীন কঠিন আগ্নেয় বা রূপান্তরিত শিলাকে **অ্যাকুইক্লুড** বলে। সাধারণভাবে জল পরিবহণে অক্ষম অসংখ্য ফাটল বা ছিদ্র সম্বলিত আগ্নেয়, রূপান্তরিত এবং পাললিক শিলাকে **অ্যাকুইটার্ড** বলে। মাটির নীচের যে তল ভূগর্ভস্থ জল দ্বারা সম্পৃক্ত থাকে তাকে ওয়াটার টেবিল বলে। সাধারণ অবস্থায় কুয়োর ভিতর দাঁড়িয়ে থাকা জলতলই হল কোন অঞ্চলের ওয়াটার টেবিল বা ভূজলের স্তর। এই ওয়াটার টেবিল কিন্তু অনুভূমিক কোন তল নয় এবং বিভিন্ন অঞ্চলে এই ওয়াটার টেবিল সমুদ্রতল (মিন সি লেভেল) থেকে একই উচ্চতায় থাকে না। ভূপৃষ্ঠের নীচের মাটি বা পাথরের মধ্যে অ্যাকুইফার এবং অ্যাকুইক্লুড বা অ্যাকুইটার্ডগুলির বিন্যাসের উপর, অঞ্চলের জলবায়ু এবং বৃষ্টিপাত, মাটি বা পাথরের জলধারণ বা জলশোষণের ক্ষমতা, ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনের হার ইত্যাদি নানা কারণে **ওয়াটার টেবিলের** অবস্থান (উচ্চতা) পৃথক পৃথক হয়।

ভূপৃষ্ঠের জলরাশি প্রথমে ভূপৃষ্ঠের মাটি ও গাছপালার

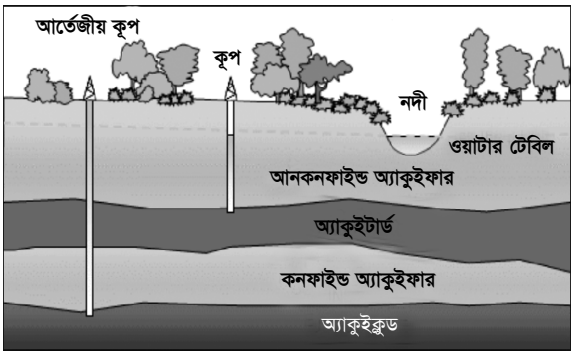

চিত্র ৩ ক ঃ কনফাইন্ড ও আন কনফাইন্ড অ্যাকুইফার

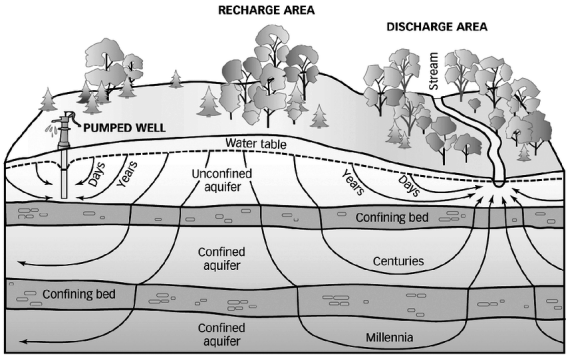

চিত্র ৩ খ ঃ কনফাইন্ড ও আন কনফাইন্ড অ্যাকুইফারে ভৌমজলের রিচার্জ এবং ডিসচার্জ

শিকড়ে কিছু সময় ক্যাপিলারি অ্যাকশন দ্বারা সঞ্চিত থাকে। তারপর সেই জল ভূগর্ভে প্রবেশ করে অসম্পৃক্ত মাটি ও পাথরে জমা হয়। এই স্তরের জলপরিবহণ ক্ষমতা কম হলে (অ্যাকুইক্লুড) তা ওই অংশে বহুসময় সঞ্চিত থাকে কিন্তু ওই জল পরিবহণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই অসম্পৃক্ত স্তর জলশোধন ও পরিবহণে সক্ষম হলে জল নীচে নেমে যায়। এইভাবে ভূপৃষ্ঠের নীচের একটা অংশের মাটির ও পাথর জল দ্বারা সম্পৃক্ত হয়। এই অবস্থায় থাকা অ্যাকুইফারকে **আনকনফাইন্ড অ্যাকুইফার**

বলে। আরও নীচের কঠিন, প্রায় ছিদ্রহীন শিলাস্তরে এই জল প্রবেশ করতে পারে না।

কোন অঞ্চলের অ্যাকুইফার যদি ভূগর্ভে জল পরিবহণ ও ধারণে অক্ষম মাটি বা পাথরের নীচে থাকে তখন তাকে **কনফাইন্ড অ্যাকুইফার** বলে। (চিত্র ঃ ৩ ক এবং খ) এক্ষেত্রে ওই অ্যাকুইফারের নীচেও যদি এমনই জল পরিবহণ ও ধারণে অক্ষম মাটি/পাথর থাকে তখন ওই অ্যাকুইফারকে **পাচর্জ অ্যাকুইফার** বলে। ভারতের মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে ডেকান বেসল্ট পাথরের মধ্যে এমনই পাতলা পাচর্জ অ্যাকুইফারে অল্প জল সঞ্চিত থাকে। ওই অঞ্চলের কুয়োতে যে উচ্চতায় জল দাঁড়িয়ে থাকে তা ওয়াটার টেবিল বা প্রকৃত জলস্তর নয়, **পিজোমেট্রিক সারফেস**। ভারতের পূর্বঘাট, পশ্চিমঘাট, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি, ডেকান মালভূমি, সিংভূম ও ছোটনাগপুরের মালভূমি, মেঘালয় মালভূমি, সাতপুরা, বিন্ধ্য, আরাবল্লী পর্বতমালা অঞ্চলে কোথাও পাচর্জ অ্যাকুইফার, কোথাও অগভীর অ্যাকুইফার, কোথাও অ্যাকুইটার্ডে সামান্য ভূ-জল সঞ্চিত আছে। জলের কুপরিবাহী, সুপরিবাহী স্তরের বিশেষ বিন্যাসের কারণে কোথাও **আর্তেজীয় কূপ**ও দেখা যায়। এইসব পর্বত ও মালভূমি অঞ্চলে বৃষ্টির জল উপরের পলি এবং নীচের পাথরের মধ্যে নানা ধরনের ফাটল (যেমন জয়েন্ট ইত্যাদি) থাকলে তার ভিতর দিয়ে জল প্রবাহিত হয়। এই অঞ্চলের নদীখাতের জল ওয়াটার টেবিলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হলে নদীর জল মাটির নীচে চলে গিয়ে নদী অন্তঃসলিলা রূপ নেয় আবার বিশেষ অবস্থায় কোথাও কোথাও নদীখাতের উপর দিয়ে ওয়াটার টেবিল গেলে দুপাড়ের মাটি/পাথরের জল নদীকে পুষ্ট করে, ফলে নদীতে বছরের বড় সময় জল দেখা যায়। (চিত্র ঃ ৪)

চিত্র ৪ ঃ ভূগর্ভ থেকে নদীতে জলের প্রবাহ

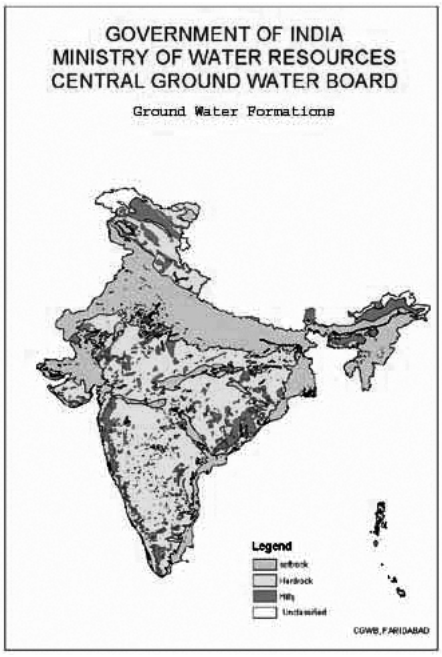

চিত্র ৫ ঃ ভারতের ভৌমজলের মানচিত্র

সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-সমভূমি এবং কৃষ্ণা-কাবেরী-গোদাবরী-মহানদী-নর্মদা প্রভৃতি নদী উপত্যকায় আনকনফাইন্ড অ্যাকুইফার বেশি দেখা যায়, যেখানে ভূগর্ভে একাধিক গভীর-অগভীর অ্যাকুইফার দেখা যায়। এই অঞ্চলের ভৌমজলের ভান্ডার বিশ্বের অন্যতম। হিমালয় পর্বতমালাতেও বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বিশেষতঃ তরাই অঞ্চলে (ভূটান সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের ডুয়ার্সসহ) ব্যাপক ভৌমজলের ভান্ডার আছে। হিমালয়ের মধ্যকার উপত্যকা অঞ্চলেও ভৌমজলের বড় ভান্ডার আছে। (চিত্র ঃ ৪ ভারতের ভৌমজলের মানচিত্র) সমভূমি এবং নদী উপত্যকায় জনবসতি, কৃষি, শিল্প এবং নগরগুলি বেশি গড়ে ওঠায় এইসব অঞ্চলের নদী-খাল-বিল-হ্রদগুলির পাশাপাশি ভূগর্ভস্থ জলের উত্তোলনও বেশি হয়। প্রাকৃতিকভাবে এর একটা বড় অংশ পুণরায় মাটির নীচের জলভান্ডারে ফিরে গেলেও কৃত্রিম উপায়ে জলকে ভূগর্ভে প্রেরণ বা রিচার্জ করার পদ্ধতি সঠিক বিজ্ঞানসম্মতভাবে নিলে এই ভান্ডার আবার পরিপূর্ণ হয়। কৃত্রিম উপায়ে রিচার্জ করা হয় বড় ও গভীর জলাশয় খনন করে যাতে ওয়াটার টেবিল জলাশয়কে স্পর্শ করে অথবা অ্যাকুইটার্ডের ফাটল দিয়ে জলধারা জলাধারে মিশতে পারে। বিশেষ পরিস্থিতিতে কূপ খনন করে (গভীর অ্যাকুইফার অবধি তার গভীরতা চাই) পাম্পের সাহায্যে বর্ষার সময় জল মাটির গভীরে প্রেরণ করা হয়।

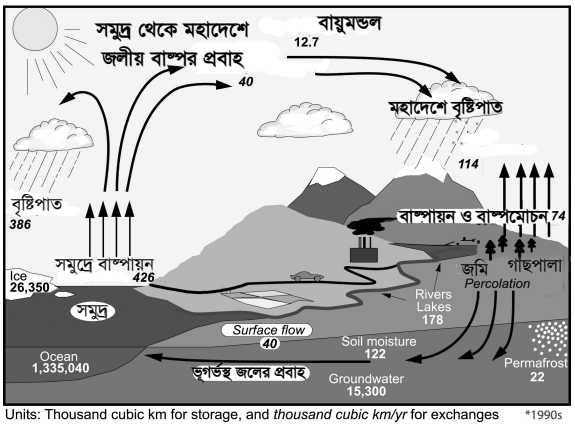

চিত্র ঃ ৬ জলচক্র বা হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল

অ্যাকুইফারের জল প্রবাহমান। পাহাড়ের গায়ে কোন ফাটল থাকলে সেই পর্বতের মধ্যে কোন অ্যাকুইফার থাকলে ভূস্তরে ছেদ বা ফাটল তৈরী হয়। তখন সেই অ্যাকুইফার থেকে ভূজল ঝর্ণার আকারে নির্গত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। তেমনি পাহাড়ের গায়ে বা সমতলের কোন হ্রদ এমনকি মানুষের তৈরি কূপ, পুকুর-খাল-বিলেও ভূজল বেরিয়ে আসে। মহাদেশীয় গভীর এবং অগভীর অ্যাকুইফার থেকে প্রতিনিয়ত প্রচুর মিষ্টি জল সমুদ্রে গিয়ে মিশছে আবার সমুদ্রের লবণাক্ত জলও মহাদেশীয় অ্যাকুইফারে মিশে যায়। এর ফলে সমুদ্র উপকূলের ভূগর্ভস্থ জল অনেক জায়গাতেই নোনতা স্বাদের হয়। ভূগর্ভস্থ জলের এই গতি সর্বদাই উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয়। বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি জানিয়েছেন যে নিরক্ষরেখার দুই দিকের (ট্রপিক্যাল জোন) অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ মিষ্টি জলের প্রায় ৫০ শতাংশই প্রতিনিয়ত সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে প্রাকৃতিক কারণে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওহিও স্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষকদের এই সংক্রান্ত গবেষণাপত্রগুলি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে জিওফিজিক্যাল রিসার্চ নামক জার্নালে। এই গবেষণাপত্রে বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে ভূতাত্ত্বিকভাবে অস্থিতিশীল অঞ্চলে যেখানে ভূত্বকে সক্রিয় চ্যুতিতলের (active fault plane) উপস্থিতি আছে সেখানে মহাদেশীয় ভূগর্ভস্থ মিষ্টিজল সমুদ্রে বেশি নিক্ষিপ্ত হচ্ছে ভূতাত্ত্বিকভাবে স্থিতিশীল অঞ্চলের তুলনায়। এছাড়া শুষ্ক, গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে মহাদেশীয় ভূজল সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মাত্রা কম। তাই ওই অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ মিষ্টি জলে লবণাক্ত সমুদ্রের জল বেশি ঢুকছে। এই গবেষকরা সমগ্র পৃথিবীর মহাদেশীয় ভূগর্ভস্থ মিষ্টি জল সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হওয়ার একটি **হাইরেসোলিউশন ম্যাপ** তৈরি করেছেন। এর সাহায্যে ভবিষ্যতে ভূগর্ভস্থ মিষ্টি জলের সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত

বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি জানিয়েছেন যে নিরক্ষরেখার দুই দিকের (ট্রপিক্যাল জোন) অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ মিষ্টি জলের প্রায় ৫০ শতাংশই প্রতিনিয়ত সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে প্রাকৃতিক কারণে।

হওয়ার নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সম্ভব হবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা প্রকাশ করেছেন। (তথ্যসূত্র ঃ দ্য হিন্দু ৯/৭/১৯, 'সায়েন্টিস্ট ক্রিয়েট এ গ্লোবাল ম্যাপ অফ হোয়ার গ্রাউন্ড ওয়াটার মিটস ওসেনস্')

সুতরাং পৃথিবীর মোট জলরাশি নানা প্রক্রিয়ায় একরূপ থেকে অন্যরূপে পরিবর্তিত হয়, এক জায়গা থেকে অন্যত্র যায়, কোন স্থানে তা স্থির থাকে না।

জলচক্র বা হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল (চিত্র ঃ ৬) হল একপ্রকার নিরন্তর জলপ্রবাহ যা বায়ুমন্ডলের নীচের স্তর এবং ভূত্বকের একটা স্তর দিয়ে প্রবাহিত হয়। পৃথিবীর মোট জলরাশি স্থির (constant) কিন্তু এই জলরাশির বিভিন্ন অংশ যেমন পাহাড়ের মাথায় বা মেরু অঞ্চলে সঞ্চিত বরফ, মিষ্টি জল, লবণাক্ত জল এবং বায়ুমন্ডলের জলীয় বাষ্পের মোট পরিমাণ কোন একটা নির্দিষ্ট সময়ে পরিবর্তনশীল হতে পারে। এই পরিবর্তন কয়েকটি কারণে ঘটতে পারে আংশিক সময়ের জন্য। এর কারণ প্রাকৃতিকও হতে পারে আবার মানুষের কার্যকলাপের জন্যও হতে পারে। প্রাকৃতিক কারণগুলি হল – (১) জলবায়ুর পরিবর্তন – উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত (২) প্লেট টেকটনিক কারণ – একটি সামুদ্রিক প্লেট যখন অন্য সামুদ্রিক প্লেট বা মহাদেশীয় প্লেটের নীচে নেমে যায় তখন সমুদ্রের বিপুল জলরাশি ভূত্বক থেকে গুরুমন্ডলে (হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেলের বাইরে) চলে যায় (৩) অগ্নুৎপাতের সময় উদ্গীরিত লাভার সাথে প্রচুর জলীয় বাষ্প (অন্য রাসায়নিকসহ) ভূপৃষ্টে নির্গত হয়। এর ফলে হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেলে ওই জলরাশি সংযুক্ত হয়।

মানুষের কার্যকলাপের জন্য অর্থাৎ কৃষি ও শিল্পের প্রয়োজনে যে পরিমাণ জলরাশি ভূগর্ভ থেকে উত্তোলিত হল তার সমপরিমাণ জল যদি মাটির গভীরে প্রবেশ না করে। নগরায়ণের ফলে জলাভূমি কমে গেলে এবং পীচ, কংক্রিটে শহর ঢেকে ফেললে একটা অঞ্চলে মাটির নীচে ভৌমজলকে ফেরৎ পাঠানোর প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয় একটা সাময়িক সময়ের জন্য।

জল এমন একপ্রকার যৌগ যার অধিকাংশই পৃথিবীর উপর

পৃথিবীর মোট জলরাশি স্থির। পৃথিবী থেকে জল নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার যে প্রচার চলছে তা আদৌ বিজ্ঞানসম্মত নয়, সম্পূর্ণ এক অপবিজ্ঞানের প্রচার। কারণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্য পৃথিবীর জলরাশি মহাকাশে চলে যেতে পারে না।

চলা নানা প্রক্রিয়ায় রাসায়নিকভাবে অপরিবর্তিত থাকে। যদিও সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় এই জলরাশির এক অতি সামান্য অংশ অন্য যৌগে সংযুক্ত হয় অথবা অন্য যৌগ থেকে জল মুক্ত হয়। অর্থাৎ এককথায় জলচক্রে পৃথিবীর মোট জলরাশি একরূপ থেকে অন্যরূপে নিরন্তর পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় চলে। পৃথিবীর এই জলরাশি বিভিন্ন অবস্থায় এবং রিজারভারে (যেখানে অবস্থান করে) লক্ষ কোটি বছর সঞ্চিত থাকতে পারে এমন ধারণাও অবৈজ্ঞানিক। বিভিন্ন ক্ষেত্র ও পরিবেশে এই জল একইরূপে কোন রিজারভারে নির্দিষ্ট সময়ই থাকতে পারে মাত্র। বিজ্ঞানীরা এই সময়কালকে **রেসিডেন্স টাইম** বলেন, যেমন –

আর্ন্টাকটিকার মত -

মেরু অঞ্চলে বরফ	সর্বোচ্চ ২০ হাজার বছর
সমুদ্রে (গড়ে)	সর্বোচ্চ ৩২০০ বছর
পর্বতের মাথায় হিমবাহরূপে	সর্বোচ্চ ২০-১০০ বছর
মরশুমি তুষারের আচ্ছাদন	সর্বোচ্চ ২-৬ মাস
মাটিতে ভেজা অবস্থায় ময়েশ্চার	সর্বোচ্চ ১-২ মাস
অগভীর অ্যাক্যুইফার	সর্বোচ্চ ১০০-২০০ বছর
গভীর অ্যাক্যুইফার	সর্বোচ্চ ১০,০০০ বছর
হ্রদ ইত্যাদি ভূপৃষ্ঠের জলাশয়	সর্বোচ্চ ৫০-১০০ বছর
নদী	সর্বোচ্চ ২-৬ মাস
বায়ুমন্ডল (জলীয় বাষ্প)	সর্বোচ্চ ৯ দিন

(তথ্যসূত্র ঃ Residence time / hydrological cycle / Britanica.com)

সুতরাং পৃথিবীর মোট জলরাশি স্থির। পৃথিবী থেকে জল নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার যে প্রচার চলছে তা আদৌ বিজ্ঞানসম্মত নয়, সম্পূর্ণ এক অপবিজ্ঞানের প্রচার কারণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্য পৃথিবীর জলরাশি মহাকাশে চলে যেতে পারে না। কিন্তু পৃথিবীতে অঞ্চল ভেদে ভূমির উপরের এবং ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ, সমুদ্রের জলের পরিমাণ, বায়ুমন্ডলের জলীয় বাষ্পের পরিমাণ, পর্বত বা মেরু অঞ্চলের হিমবাহের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তন হয় জলবায়ুর পরিবর্তন, ভূতাত্ত্বিক কারণ এবং মানুষের দ্বারা জলের ব্যবহারের জন্য। উপরের আলোচনা থেকে এটাও বোঝা গেল যে 'ভূগর্ভস্থ জল কোন অঞ্চলে লক্ষ কোটি বছর সঞ্চিত থাকে' এই প্রচার কতটা ভ্রান্ত ! মানুষের ব্যবহার ছাড়াই তার পরিমাণ অঞ্চলভেদে ফারাক হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। মনুষ্যজনিত কারণে কৃষি, শিল্প, নগরায়ণের সময় ভূগর্ভস্থ জলের উত্তোলনের মাত্রা (discharge rate) যদি প্রাকৃতিক ও মানুষের দ্বারা মাটির গভীরে জলপ্রেরণের মাত্রা (recharge rate) থেকে কম হয় তবে বিভিন্ন অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে যায়।

ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলে গত ৩০ বছরে গড় বৃষ্টিপাত কমেছে। এই পরিবর্তন প্রাকৃতিক কারণেই ঘটেছে এবং মানুষের ভূমিকা এক্ষেত্রে নগণ্য।

যে ঘটনাগুলিকে দায়ী করা হচ্ছে তার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ ঃ

আসন্ন জলসঙ্কট নিয়ে যে বিষয়গুলিকে প্রচারের আলোয় আনা হচ্ছে এবার আসুন একে একে তার যথাযথ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা যাক।

(১) মনুষ্যসৃষ্টি বিশ্ব উষ্ণায়ন ঃএ প্রসঙ্গে অতীতেও সমীক্ষণে বহু বিস্তারিত চর্চা হয়েছে যে আজ থেকে প্রায় ২৫০ কোটি বছর আগে থেকে (অর্থাৎ প্রোটেরোজোয়িক যুগ থেকে) সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক কারণে (মুখ্যত সূর্য এবং পৃথিবীর দূরত্ব ও অবস্থান বদলের জন্য) পৃথিবী চক্রাকারে উষ্ণ এবং শীতল হয়েছে। মনুষ্যজনিত কারণে বিশ্ব উষ্ণায়ন একটি অতি গৌণ বিষয়। এছাড়া বর্তমানে পৃথিবী বরফযুগের একটি আন্তঃগ্লেসিয়াল ফেজ (interglacial phase) -এ রয়েছে। বড় আকারে বিশ্ব উষ্ণায়ন পৃথিবীর বুকে যেগুলি ঘটেছিল, যেমন ক্যাম্ব্রিয়ান-অর্ডোভিসিয়ান যুগে (আজ থেকে প্রায় ৫০ কোটি বছর), ডেভোনিয়ান যুগে (আজ থেকে প্রায় ৪০ কোটি বছর আগে), জুরাসিক-ক্রিটেসিয়াস যুগ (আজ থেকে প্রায় ১২-১৩ কোটি বছর আগে) তখন পৃথিবীর সমস্ত সুউচ্চ পর্বতমালা এবং মেরু অঞ্চলের বরফ প্রায় সবই গলে গেছিল, সমুদ্রতলের বিরাট উত্থান ঘটেছিল। বর্তমানে interglacial phase-এ যে উষ্ণায়ন চলছে তা অনেক নীচু মাত্রার এবং তাই সুউচ্চ পর্বতমালা এবং মেরু অঞ্চলের অধিকাংশ বরফই টিকে আছে। এই উষ্ণায়ন যদি

আগেকার বৃহৎ উষ্ণায়নের সময়কালের মত হত তবে হিমালয়ের সব বরফ গলে গিয়ে প্রথমে নদীগুলিতে বিরাট আকারে জলরাশি দেখা যেত, সমুদ্রতল উপরে উঠে সমুদ্রের দ্বীপগুলি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত (জলের তলায় চলে যেত)। প্রসঙ্গত বলা যায় যে টারসিয়ারি যুগের মধ্যভাগে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় দেড় কোটি বছর আগে বিশ্ব উষ্ণায়নের সময় বর্তমান বাংলাদেশসহ পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া-বাঁকুড়া ছাড়া প্রায় সমগ্র দক্ষিণবঙ্গই জলের তলায় ছিল।

মনুষ্যজনিত বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধিকে গোঁজামিলের যুক্তি দিয়ে যেসব ব্যাখ্যা প্রচার করা হচ্ছে তাও বিজ্ঞানসম্মত নয়।

সম্প্রতি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল মেটেরোলজি, পুণে এবং অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এক গবেষণার পর জানিয়েছেন যে ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলে গত ৩০ বছরে গড় বৃষ্টিপাত কমেছে। এই পরিবর্তন প্রাকৃতিক কারণেই ঘটেছে এবং মানুষের ভূমিকা এক্ষেত্রে নগণ্য। এই রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়েছে গত ৫ই জুন ২০১৯ দ্য হিন্দু পত্রিকায় 'Why is north-east drying up rapidly?' রচনায় বলা হয়েছে ১৯০১-২০১৪ সাল এই সময়কালের মধ্যকার শেষ ৩৬ বছর অর্থাৎ ১৯৭৮ থেকে ২০১৪ সালের পর্যায়কালে জলবায়ুর পরিবর্তন প্রাকৃতিক কারণেই ঘটেছে। ("... while the trend during the last 36 years is associated with natural phenomena".

"Only about 7% of the rainfall in this region is associated with local moisture recycling, which means that anthropogenic activities can affect only this small percentage. So we concluded that the recent rapid drying is a part of interdecadal rainfall which is strongly associated with PDO (Pacific decadal Oscillation)"

"We found that changes in the Pacific decadal osciallition (PDO) - a pattern of fluctuations in the ocean, particularly over the north Pacific basin - are mainly associated with this declined rainfall." বৈজ্ঞানিক তথ্য নিজেই যখন উত্তর দেয় তখন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

অন্যদিকে এটাও আমরা লক্ষ্য করছি যে বিগত এক দশক বা তার বেশি সময়কাল ধরে পশ্চিম ভারতে বিশেষতঃ পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় যেমন কেরল, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের একাংশ এবং গুজরাতের একাংশ ও উত্তর রাজস্থানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেড়েছে। এর কারণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হাতে থাকলে তারও বিচার করা যেত।

(২) জনসংখ্যাবৃদ্ধি ঃ একথা সত্য যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

বিদেশে জল পাচার কোন পথে হচ্ছে এটা পরিবেশবাদীরা আমাদের বুঝিয়ে দিলে ভাল হত। যাই হোক এইসব বিদ্বজন বা পরিবেশবাদীরা সংঙ্কটগ্রস্থ পুঁজিবাদকে আড়াল করতে অপবিজ্ঞানের প্রচার করছেন।

কমলেও ভারত তথা সমগ্র বিশ্বেই প্রায় জনসংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান। এখন প্রশ্ন হল সমুদ্র এবং মহাদেশে যে জলের ভান্ডার আছে মানুষ তার কতটুকুই বা ব্যবহার করে? এই প্রশ্নে সংশয়ের যথাযথ জবাব রচনার শেষে পেয়ে যাবেন আশা করা যায়।

(৩) রাসায়নিক সার, কীটনাশক ব্যবহারজনিত ও শিল্পজাত জলদূষণ ঃ

একে সরাসরি জলাভাবের কারণ বলা কি বিজ্ঞানসম্মত? রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয় মাটিতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, জিঙ্ক প্রভৃতি মৌলের ঘাটতিপূরণের জন্য। অবৈজ্ঞানিক এবং মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে ফসলের ক্ষতি হয়, এতে ভূগর্ভের জলস্তর কমবে কেন? কীটনাশক ব্যবহার পোকার হাত থেকে ফসল বাঁচানোর জন্য। এর অপরিমিত ব্যবহার ফসলে কীটনাশকের অনুপ্রবেশ ঘটায় এবং কৃষকের শারিরীক ক্ষতি করতে পারে কিন্তু জলস্তর নেমে যাওয়ার সাথে এর ব্যবহারের সম্পর্ক কী? আসলে এই সার ও কীটনাশক ব্যবহারে জলদূষণ হলে ব্যবহারযোগ্য জলের ঘাটতির কথা বলতে চাওয়া হচ্ছে, এটা সঠিক এবং এর বিজ্ঞানসম্মত নিয়ন্ত্রণ (বিশেষতঃ কীটনাশক ব্যবহারের) দরকার। কিন্তু এগুলির ব্যবহার বন্ধ করতে হবে এই বক্তব্য বিজ্ঞানসম্মত ও প্রগতিশীল নয়। এর যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ও সফল প্রয়োগ হতে পারে মানুষের জন্য এবং মানুষের স্বার্থে পরিকল্পিত সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায়। বর্তমানে মুনাফার লক্ষ্যে পরিচালিত পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় হতে পারে না যা কখনও পরিকল্পিত উৎপাদন ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব নয়।

শিল্পজাত রাসায়নিক বর্জ্য জলদূষণ ঘটায় এবং তা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণও সম্ভব। কিন্তু শিল্প মালিকশ্রেণী তার উৎপাদন খরচ কমাতে এটা করে না বা করবেও না। পুঁজিবাদী সরকার এই বিষয় মালিকশ্রেণীকে বাধ্যও করতে পারে না। একমাত্র সচেতন জনতার গণআন্দোলনই শিল্পমালিকদের আংশিকভাবে বাধ্য করতে পারে।

(৪) উচ্চফলনশীল শস্য এবং উদ্ভিদের চাষ ঃ বিগত

প্রচার হচ্ছে ১ কে.জি আধুনিক বীজ দ্বারা চাল উৎপাদনে ২০০০-৩০০০ লিটার জল লাগে। এতে নাকি ওই জল বিদেশে পাচার হচ্ছে। এইসব উচ্চফলনশীল ধান, গম, আখ বা অন্য শস্য মাটি থেকে বেশি জল শোষণ করে এমন বক্তব্যের সত্যতা কী?

শতাব্দীর ছয়ের দশ থেকে প্রথমতঃ পাঞ্জাব-হরিয়ানা-উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে উচ্চ ফলনশীল শস্য চাষ শুরু হয়। শুরু হয় কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার। একে ভারতের শাসকশ্রেণী সবুজ বিপ্লব আখ্যা দিয়েছে। পরবর্তীতে প্রায় সারা দেশেই এই ধরনের উৎপাদন ধীরে ধীরে চালু হয়েছে। এই কৃষিব্যবস্থা পুরানো প্রকৃতি নির্ভর ভোগের জন্য উৎপাদন ব্যবস্থার বদলে বাজারমুখী কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত পুঁজিবাদী কৃষির প্রচলন করেছে। অতীতে শুধুমাত্র মৌসুমীবায়ুর প্রভাবে এবং অন্য প্রাকৃতিক কারণে হওয়া বৃষ্টির জলেই অধিকাংশ জমিতে একবার চাষ হত। এখন আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে এবং নানা অ-প্রাকৃতিক সংকর বীজের সাহায্যে বছরে অনেক জমিতেই ৩-৪ বার পর্যন্ত চাষ হচ্ছে। বৃষ্টিপাতের সময় বাদে অন্য সময়ের এই চাষে তাই নদী থেকে খাল খনন করে সেচের প্রয়োজন হয়। পরবর্তীতে আরও উৎপাদনের বিকাশের স্বার্থে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার শুরু হয়। এর ফলে এখন প্রায় সব ধরনের প্রাকৃতিক জলের উৎসের ব্যবহার হচ্ছে। অপরিকল্পিত উৎপাদন ব্যবস্থায় ছোট ছোট প্লটে নানা প্রতিকূলতাকে জয় করে এদেশের মাটির স্বাভাবিক গুণ এবং কৃষকের মেধা ও পরিশ্রমে ধান, গম, ডাল, নানা শস্য এবং সব্জি উৎপাদনে ভারত বিশ্বের প্রথম থেকে চতুর্থ স্থানে পৌঁছেছে। দুঃখজনক বিষয় হল এই যে বিকাশের গতির পথে বাধা দূর করার বদলে পরিবেশবাদীরা এবং সরকার নানাভাবে এই বিকাশ রুদ্ধ করতে চাইছে। দেশের ব্যাপক কৃষকসমাজ পরিবেশবাদীদের যুক্তি মেনে নেন নি। মানব সমাজের বিকাশের স্বার্থে এবং সমাজ বিজ্ঞানের চোখে পরিবেশবাদীদের এই যুক্তি প্রতিক্রিয়াশীল।

প্রচার হচ্ছে ১ কে.জি আধুনিক বীজ দ্বারা চাল উৎপাদনে ২০০০-৩০০০ লিটার জল লাগে। এতে নাকি ওই জল বিদেশে পাচার হচ্ছে? এইসব উচ্চফলনশীল ধান, গম, আখ বা অন্য শস্য মাটি থেকে বেশি জল শোষণ করে এমন বক্তব্যের সত্যতা কী? বৈজ্ঞানিক কোন প্রমাণ আছে কী? আসলে অতীতে যে ধান/গম চাষ হত তা বিঘায় ৩-৪ মণ ফলন দিত। এখন ওই একই পরিমাণ জমিতে ২০-২২ মণ বা তারও অধিক ফলন হয়। এই পরিমাণ গাছ এবং তার ফলের জন্য বেশি জল লাগা মানে কে.জি প্রতি বেশি জল লাগা? মনে রাখতে হবে ধান/গমের মূল হল গুচ্ছ মূল। মাটির গভীরে বড় জোর ৬ ইঞ্চি প্রবেশ করে এবং তার জলশোষণ করার ক্ষমতা বিশাল বৃক্ষের তুলনায় নগণ্য। বলা হচ্ছে এই চাষে প্রচুর জল মাটিতে চলে যায় এতে ভূগর্ভের জন্য পয়সা দিয়ে তুলে নষ্ট হচ্ছে। তাহলে কি দাঁড়াল? এইসব চাষের জমিতে জল দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে মাটিতে শোষিত হয়ে ফেরৎ যায়। এটা ভূগর্ভের জল অ্যাকুইফারে রিচার্জের জন্য ভাল ব্যাপার নয় কী? বিদেশে জল পাচার কোন পথে হচ্ছে এটা পরিবেশবাদীরা আমাদের বুঝিয়ে দিলে ভাল হত। যাই হোক এইসব বিদ্বজন বা পরিবেশবাদীরা সংঙ্কটগ্রস্থ পুঁজিবাদকে আড়াল করতে অপবিজ্ঞানের প্রচার করছেন।

বনভূমির গাছপালা কি ভূগর্ভের জল বাড়ায়? ভূগর্ভের জলের পুণঃসংযোজন করে? এর উত্তর হল না। বরং বৃক্ষ বিপুল পরিমাণ ভূগর্ভস্থ জল শোষণ করে মাটির গভীর থেকে। এই জলের সামান্য অংশ খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় আর বাকি অংশ বাষ্পমোচন প্রক্রিয়ায় জলীয় বাষ্পরূপে বায়ুমন্ডলে চলে যায়। অর্থাৎজলস্তর সাময়িকভাবে নামিয়ে দেয়।

(৫) সেচ ব্যবস্থা ঃ এটা সত্য যে ভারতের অধিকাংশ সেচ প্রকল্প নদীবিজ্ঞানকে না মেনে অবৈজ্ঞানিকভাবে গড়ে উঠেছে দেশী বিদেশী পুঁজিসংস্থার বিনিয়োগের স্বার্থে। তাই বহু সেচ প্রকল্পই অকার্যকরী হয়ে আছে। কিন্তু তাই বলে সামগ্রিকভাবে সেচ ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে, নদীকে নিজের মত বইতে দিতে হবে, প্রাচীন প্রকৃতিনির্ভর কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে? সেচ ব্যবস্থা নদী ও ভূগর্ভের জলের ভান্ডার নষ্ট করে দেয় এই প্রচার আসলে বিজ্ঞানসম্মত নয়, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

(৬) বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী ঃ সরকারি মহল এবং পরিবেশবাদীরা লাগাতারভাবে প্রচার করে জলাভাব, বিশ্ব উষ্ণায়ন, বৃষ্টিপাত হ্রাস, খরা-বন্যা সবকিছুর জন্যই জঙ্গল বা

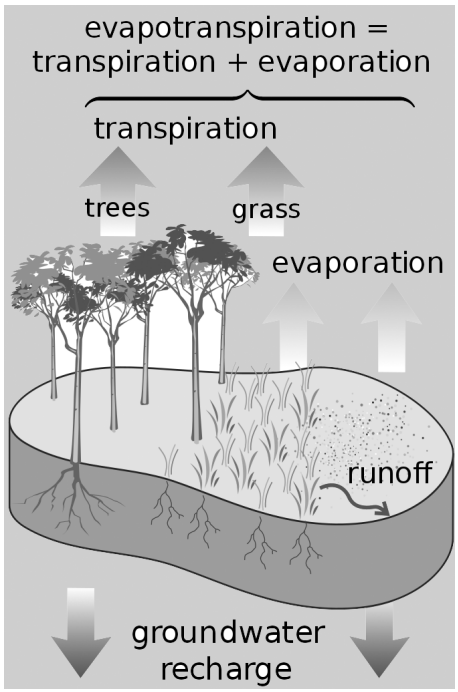

চিত্র ঃ ৭ বৃক্ষ দ্বারা জলশোষণ ও বাষ্পমোচন

বনভূমির গাছকাটাই একমাত্র কারণ। প্রথমতঃ সাধারণ মানুষ সভ্যতা বিকাশের শুরু থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত বৃক্ষরোপণ করে গাছের যত্ন নিয়ে আসছে গাছের ছায়া, গাছের ফলমূল বা ওষধী পেতে। পুকুর বা নদীর পাড়ে পাড় শক্ত করার জন্য গাছ লাগানো হয় অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষা থেকে। সাধারণ মানুষ বা জঙ্গলবাসী ব্যাপক অর্থে বৃক্ষছেদন কোনদিনই করে না। মরা গাছের ডালপালা, পাতা সংগ্রহ করে আবার নতুন গাছ লাগায়। বৃহৎ কাঠের ব্যবসায়ী, তার চোরাচালানকারী এবং সরকারী মহলের নানা হর্তা কর্তারাই একাজ করে আসছে দীর্ঘকাল ধরে। বহু জায়গায় প্রমাণ হয়েছে যে ওষুধ প্রয়োগ করে গাছ মেরে তারপর সরকারি টেন্ডার দিয়ে তা কাটা হয়েছে। শিল্পায়ণ, নগরায়ণ, খনির স্থাপনা, বড় রাস্তা, ব্রীজ, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি কাজে গাছ কাটা হয়। এসবে সাধারণ মানুষের কোন ভূমিকা নেই। এখন আইন করে দেশের সমগ্র বনাঞ্চলের একচেটিয়া অধিকার কায়েম হয়েছে একচেটিয়া মালিকশ্রেণী ও তার সরকারের হাতে। অর্থনীতিতে কয়েক দশক ধরে ব্যাপক মন্দা চলায় এবং তা কার্যতঃ স্থায়ীরূপ নেওয়ায় এবং ব্যাপক বৃক্ষরোপণের ফলে গত এক দশক ধরে সারা বিশ্বের মত এদেশেও বনভূমি অল্প হলেও বেড়েছে।

এখন প্রশ্ন হল বনভূমির গাছপালা কি ভূগর্ভের জল বাড়ায়? (চিত্র ৭) ভূগর্ভের জলের পুণঃসংযোজন করে? এর উত্তর হল না। বরং বৃক্ষ বিপুল পরিমাণ ভূগর্ভস্থ জল শোষণ করে মাটির গভীর থেকে। এই জলের সামান্য অংশ খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় আর বাকি অংশ বাষ্পমোচন প্রক্রিয়ায় জলীয় বাষ্পরূপে বায়ুমন্ডলে চলে যায়। অর্থাৎ জলস্তর সাময়িকভাবে নামিয়ে দেয়। এই বিজ্ঞান জানা সত্ত্বেও সরকারের 'জলশক্তি অভিযান' ভূগর্ভের জলভান্ডার বাড়াতে ব্যাপক আকারে বৃক্ষরোপণের কর্মসূচী নতুন করে শুরু করছে।

বর্তমান জলাভাবের দায় কার ?

বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অংশে ভূপৃষ্ঠের উপর এবং নীচে যে জলাভাব দেখা দিয়েছে সে বিষয় সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এর জন্য কি দেশের মানুষের দ্বারা জলের অপচয়, আধুনিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা, সেচ ব্যবস্থা দায়ী নাকি এর দায় অন্য কারও? স্পষ্টভাবে বলতে গেলে এর দায় হল –

(১) দেশ জুড়ে যে ৭৪২৬টি লাইসেন্স প্রাপ্ত এবং অগুণিত লাইসেন্সহীন বোতল বন্দি পানীয় জল ও ঠান্ডা পাণীয় উৎপাদনের ফ্যাক্টরি হয়েছে দেশী-বিদেশী ও সরকারী মালিকানায়। তারা যথেচ্ছভাবে নদী, জলাশয়, ঝর্ণা, ভূগর্ভস্থ জল তুলে বিরাট জলের ব্যবসা ফেঁদেছে এবং বিনিয়োজিত পুঁজির ৩০০-৪০০ গুণ মুনাফা করছে। এই জলাভাবের মূল দায় এদের। সাম্প্রতিক জলাভাব দূর করতে গেলে এদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সমস্ত প্রকার জলব্যবসা বন্ধ করতে হবে।

(২) দেশ জুড়ে যেসব শিল্পমালিকরা শিল্পের জন্য প্রচুর ভূপৃষ্ঠের এবং ভূগর্ভের জল ব্যবহার করছে কিন্তু ভূগর্ভে জল ফেরত দেওয়ার জন্য শিল্পক্ষেত্রের চর্তুদিকে বড় বড় জলাশয় বানিয়ে এবং পাম্পের সাহায্যে জল মাটির গভীরে ফেরত দেওয়ার কোন কাজ করছে না, শিল্পজাত বর্জ্যসমৃদ্ধ জল শোধন না করে অদূষিত জল ও পরিবেশকে দূষিত করছে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জল ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক নিয়ম উপেক্ষা করলে শ্রমিকদের মজুরি দিয়ে শিল্প কারখানায় উৎপাদন বন্ধ করে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে। কারণ এর জন্য শ্রমিকরা দায়ী নয়।

(৩) নগরায়ণের নামে যত্রতত্র জলাভূমি বুজিয়ে এবং ভূগর্ভের জলস্তর বিন্যাসকে উপেক্ষা করে যেসব আবাসন, অফিস, বাড়ি, ফ্লাইওভার ইত্যাদি নির্মিত হচ্ছে তা

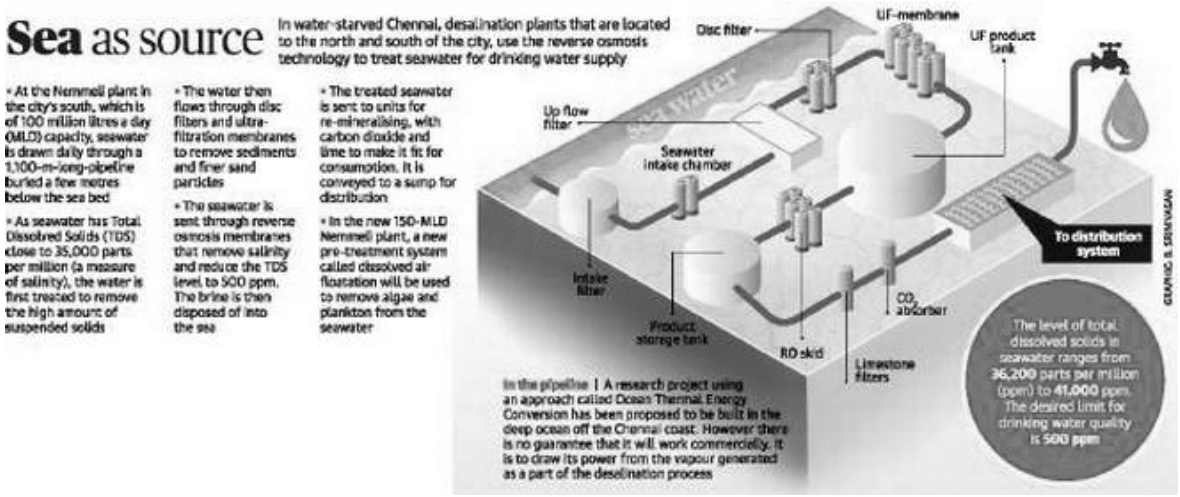

চিত্র ঃ ৮ রিভার্স অসমোসিস প্রক্রিয়ায় সমুদ্রের জলশোধন

প্রাকৃতিকভাবে ভূগর্ভে জল রিচার্জ এর নিয়মে বাধা সৃষ্টি করছে। অবিলম্বে জলবিদ্যার নিয়ম নেমে নগরায়ণের প্রকল্প চালু করতে হবে এবং যেসব প্রকল্পগুলি সমস্যা সৃষ্টি করেছে তাকে বৈজ্ঞানিকভাবে সংস্কার করতে হবে।

ভারতে কি সত্যিই এক তীব্র জলসঙ্কট আসন্ন?
তবে এর সমাধান সম্ভব কোন পথে?

বর্তমানে যে জলভাবের চিত্র সামনে এসেছে তার সমাধানের রাস্তা খুঁজে পেলেই ভারতে আসন্ন তীব্র জলসঙ্কটের স্বরূপ বোঝা সম্ভব। তাই আসুন জলাভাবের সমস্যার বৈজ্ঞানিক পথ আগে খুঁজে বার করা যাক। জলসংক্রান্ত বিজ্ঞান তথা জলবিদ্যার মধ্যেই এর সমাধানের রাস্তা লুকিয়ে আছে।

আগেই চর্চা হয়েছে যে পৃথিবীর মোট জলরাশির পরিমাণ স্থির, যদিও সাময়িক সময়ের জন্য এই জলের মাত্রা বা পরিমাণ বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন অবস্থায় বায়ুমন্ডল, মহাদেশের ভূত্বকের উপর, ভূগর্ভ এবং সমুদ্রে থাকে। পৃথিবীর মোট জলরাশির প্রায় ৯৭ শতাংশই সমুদ্রে আছে। সমুদ্রের জল সূর্যালোকের তাপে প্রাকৃতিক নিয়মেই লবণমুক্ত হয়ে বাষ্পীভূত অবস্থায় বায়ুমন্ডলে আসে এবং মিষ্টি বৃষ্টির জল ও বরফ রূপে মহাদেশ ও সাগরে পতিত হয়। সমুদ্রের এই নোনা জল যখন প্রাকৃতিক নিয়মেই বৃষ্টির মিষ্টি জল বা বরফ হয়ে মহাদেশের নদী নালা, জলাশয় এবং ভূগর্ভের জল হিসাবে সঞ্চিত হয় তখন মানুষ কেন এই প্রাকৃতিক নিয়ম বা বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে প্রযুক্তির সাহায্যে সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে লবণমুক্ত করে দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম, কৃষিকাজ, শিল্প উৎপাদন ইত্যাদি কাজ করতে পারবে

সমুদ্রের জল সূর্যালোকের তাপে প্রাকৃতিক নিয়মেই লবণমুক্ত হয়ে বাষ্পীভূত অবস্থায় বায়ুমন্ডলে আসে এবং মিষ্টি বৃষ্টির জল ও বরফ রূপে মহাদেশ ও সাগরে পতিত হয়। সমুদ্রের এই নোনা জল যখন প্রাকৃতিক নিয়মেই বৃষ্টির মিষ্টি জল বা বরফ হয়ে মহাদেশের নদী নালা, জলাশয় এবং ভূগর্ভের জল হিসাবে সঞ্চিত হয় তখন মানুষ কেন এই প্রাকৃতিক নিয়ম বা বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে প্রযুক্তির সাহায্যে সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে লবণমুক্ত করে দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম, কৃষিকাজ, শিল্প উৎপাদন ইত্যাদি কাজ করতে পারবে না?

না? এই কাজ অনায়াসেই করা সম্ভব এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ, ভারত এমনকি আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গেও তা করা হয়েছে এবং হচ্ছে। আরব দেশগুলির শুষ্ক, গ্রীষ্মপ্রধান মরুভূমিতে বহুদিন যাবৎ সমুদ্র থেকে লবণাক্ত জল তুলে তা লবণমুক্ত করে মানুষ স্নান, পানীয় হিসাবে, কৃষিকাজে ও শিল্পে ব্যবহার করছে। এইভাবে শুষ্ক, ধূসর মরুভূমির একটা বড় অংশ সবুজ হয়ে গেছে। ভারতেও এর প্রচলন হয়েছে ১৯৯০ সাল থেকে। প্রধানতঃ ৩টি পদ্ধতিতে সমুদ্রের জল লবণমুক্ত করা হয়। এগুলি হল –

(১) মাল্টি স্টেজ ফ্লেস (এম এস এফ) ইভাপোরেশন
(২) রিভার্স অসমোসিস (আর ও)
(৩) লো টেমপারেচার ইভাপোরেশন (এল টি ই)

এর মধ্যে রিভার্স অসমোসিস (বা R. O) পদ্ধতিই সর্বাধিক প্রচলিত (চিত্র ৮)। এই পদ্ধতিতে প্রথমে সমুদ্র থেকে পাইপে করে জল এনে তাতে দ্রবীভূত কণাগুলি (Total Dissolved solids বা TDS), যার পরিমাণ প্রতি ১০ লক্ষ কণায় প্রায় ৩৫ হাজার কণা, যতটা সম্ভব পরিশ্রুত করা হয়। এরপর এই আংশিক পরিশ্রুত জলকে চাকতির ন্যায় ফিল্টার এবং অতি সূক্ষ্ম ফিল্টার মেমব্রেন (ultra filtration membrane) বা পর্দা দিয়ে ফিল্টার করলে জলে দ্রবীভূত কাদা এবং সূক্ষ্ম বালির কণা অপসারণ করা হয়। এরপর এই জল পাঠানো হয় রিভার্স অসমোসিস মেমব্রেনস্-এ। এখানে লবণাক্ততা আরও কমে ৫০০/প্রতি ১০ লক্ষ কণায় পৌঁছায়। এরপর এই পরিশ্রুত জলকে পানযোগ্য করার জন্য তাতে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং

বর্তমানে বিশ্বের মোট ১৫০টি দেশে এরকম প্রায় ১৮ হাজার প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইসরাইলের অর্ধেকের বেশি জল সমুদ্র থেকে লবণমুক্ত করে সরবরাহ করা হয়।

লাইম (Cao) যুক্ত করা হয়। এরপর ওই জল থেকে শ্যাওলা এবং অন্য সূক্ষ্ম জৈব পদার্থ অপসারণ করে বিশুদ্ধ পানযোগ্য মিষ্টি পানীয় জল পাওয়া যায়। তামিলনাড়ুর চেন্নাই শহরের ৫০ কি. মি দক্ষিণে বসানো নেম্মেলি প্লান্ট থেকে বর্তমানে প্রতিদিন ১০০ মিলিয়ন লিটার বা ১০ কোটি লিটার পানীয় জল উৎপাদন হচ্ছে। এই প্লান্টটি ২০১০ সালে স্থাপিত হয় এবং ২০১৩ সালে চেন্নাই শহরের ৩০ কি. মি উত্তরে মিনজুর-এ অন্য একটি প্লান্ট বসান হয়। ১৯৯৯ সালে মুম্বইয়ের ট্রম্বেতে এবং ২০০৩ সালে রাজস্থানের যোধপুরে এই রিভার্স অসমোসিস প্রক্রিয়ায় লবণাক্ত জলকে শুদ্ধ করার প্লান্ট বসানো হয়।

১৯৫০ সাল থেকেই এই প্রযুক্তির প্রয়োগ বিশ্বজুড়ে শুরু হয়েছে এবং বর্তমানে বিশ্বের মোট ১৫০টি দেশে এরকম প্রায় ১৮ হাজার প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইসরাইলের অর্ধেকের বেশি জল সমুদ্র থেকে লবণমুক্ত করে সরবরাহ করা হয়। সম্প্রতি চেন্নাই শহরের নিকট দৈনিক ৮৩

চেন্নাই এর প্লান্টে প্রতি ১০০০ লিটার জল উৎপাদনে খরচ হয় মাত্র ৪ ইউনিট বিদ্যুৎ এবং কোম্পানির লাভ রেখে প্রতি ১০০ লিটারে উৎপাদন খরচ মাত্র ৩ টাকা অর্থাৎ লিটার প্রতি মাত্র ৩ পয়সা। এই খরচ ২০ টাকা/লিটার বোতলবন্দি জলের চেয়ে কতটা বেশি দামী বিচার করুন!

কোটি লিটার উৎপাদনে সক্ষম একটি প্লান্ট বসানো হতে চলেছে। গুজরাতের জামনগরে দৈনিক ১০ কোটি লিটার উৎপাদনে সক্ষম প্লান্ট এবং দ্বারকা, কচ্ছ, দহেন, সোমনাথ, ভাবনগর এবং পিপাভাবে একই ক্ষমতা সম্পন্ন প্লান্ট বসানো হতে চলেছে। (তথ্যসূত্র ঃ 'Is Sea water the ultimate answer', The Hindu, 7th July 2019)

আনন্দবাজার পত্রিকায় গত ২০শে জুলাই সম্পাদক সমীপেষু কলমে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বাসন্তী থেকে শ্রী প্রভুদান হালদার আমাদের পশ্চিমবঙ্গে সমুদ্রের জল লবণমুক্ত করে সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানিয়েছেন। শ্রী প্রভুদান হালদার লিখেছেন "গত ২২ জুন ২০০৯ থেকে বাসন্তীর নদী পার্শ্বস্থ পালপাড়ায় এই যন্ত্রটি চালু হয়। হোগল নদীর জল পাম্পের সাহায্যে এই যন্ত্রে প্রবেশ করে সুস্বাদু পানীয়ে রূপান্তর হচ্ছে দেখে এলাকার মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এ এক অসাধ্য সাধন হয়েছিল। এর ফলও হত সুদূরপ্রসারী। এই যন্ত্রের ব্যবহারে ভূনিম্নস্থ জলের অপচয় কমার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। যেখানে টিউবওয়েল বসানো যায় না, সুন্দরবনে যাঁরা পুকুরের জল পান করেন, আয়লায় যাঁরা নোনা জল খাচ্ছেন, তাঁরা শুদ্ধ

জলসঙ্কট নিয়ে এই প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য জল নিয়ে যে চালু ব্যবসা চলছে তার বাজার আরও প্রসারিত করা এবং কৃষিপণ্যের বাজারে যে ভয়াবহ মন্দা চলছে সেই মন্দার হাত থেকে পুঁজিপতিশ্রেণীকে রক্ষা করার জন্য ভারতের স্বতঃস্ফূর্ত কৃষির বিকাশের গতি রুদ্ধ করা।

পানীয় জল পাবেন, এমন আশা করেছিলেন এই এলাকার মানুষ।

'এম এম পি ফিল্ট্রেশন প্রাইভেট লিমিটেড' নামে এক কোম্পানি এই বিদেশি ফিল্টারাইজেশন যন্ত্রটি এখানে বসিয়েছিল। এক ঘণ্টায় দু'হাজার লিটার করে হাজার হাজার বোতলে ভরে পানীয় হিসাবে পাঠাত গোসাবার আয়লা দুর্গত এলাকায়। এই জল উৎপাদনে প্রতি লিটারে তখন খরচ ছিল মাত্র ৫ পয়সা। গোসাবার পাখিরালয়ে একটি ইউনিট বসানোর কথা ছিল হেরিটেজ গ্রুপের। গোসাবার আরও দু'এক জায়গায় এই ইউনিট বসবে জেনে এলাকার মানুষ তখন খুশি হন। এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রটি চালু হয়ে মাত্র ১৫ দিন চলেছিল। এরপর বন্ধ থাকে। তিন মাস বন্ধ থাকার পর হঠাৎ সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে কোম্পানি যন্ত্রটি ফেরত নিয়ে যায়। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ এই যন্ত্রটির জন্য চেয়েছিলেন মাত্র ১৮ লক্ষ টাকা। কিন্তু পি এইচ ই (পাবলিক হেল্‌থ ইঞ্জিনিয়ারিং) নাকি ওই যন্ত্রের ছাড়পত্র দেয় নি। ফলে ওঁরা সেটি ফেরত নিয়ে যেতে বাধ্য হন। এখন প্রশ্ন, এরকম একটা যন্ত্র চালানোর ছাড়পত্র দেওয়া হল না কেন?"

শ্রী প্রভুদান হালদার মহাশয় জীবন্ত বাস্তব সমাধানকে সামনে তুলে ধরে, তার রূপায়ণ হল না কেন সেই প্রশ্নই সামনে এনেছেন।

অর্থাৎ বহুদিন আগেই বিজ্ঞান জলসমস্যার স্থায়ী সমাধান করে ফেলেছে। সমুদ্রের অফুরন্ত জলের ভান্ডার থাকা সত্ত্বেও, তাকে পরিশ্রুত করার প্রযুক্তি থাকা সত্ত্বেও জলের সংকট নিয়ে এত প্রচার তাই অর্থহীন নয় কী? ব্যবসায়িক লক্ষ্যে এই সমুদ্রের জল থেকে মানুষের ব্যবহার্য জল উৎপাদনের আংশিক রূপায়ণও হয়েছে এবং হচ্ছে বিশ্বের অধিকাংশ (১৫০টি) দেশে।

সমস্যার স্থায়ী সমাধান সামনে হাজির হয়ে যাওয়ায় নীতি আয়োগ তথা সরকার এবং নানা মহল দ্বারা প্রচারিত 'ভয়াবহ জলসঙ্কট আসন্ন' এই গল্প দেশের কোটি কোটি জনতা ফুৎকারে যেন উড়িয়ে দিতে না পারে তাই পরিবেশবাদীদের একাংশ এবং রাষ্ট্রের কিছু ভাড়াটে বিজ্ঞানী প্রচার করছে এই প্রক্রিয়া সমুদ্রের জীববৈচিত্র নষ্ট করে দেবে, বিপুল বিদ্যুৎ শক্তির অপচয় হবে, প্রচুর ব্যয়বহুল প্রকল্প বন্ধ কর ইত্যাদি। এর জবাব দেওয়াও তাই বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের কর্তব্য।

প্রথমতঃ চেন্নাই এর প্লান্টে প্রতি ১০০০ লিটার জল উৎপাদনে খরচ হয় মাত্র ৪ ইউনিট বিদ্যুৎ এবং কোম্পানির লাভ রেখে প্রতি ১০০ লিটারে উৎপাদন খরচ মাত্র ৩ টাকা অর্থাৎ লিটার প্রতি মাত্র ৩ পয়সা। এই খরচ ২০ টাকা/লিটার বোতলবন্দি জলের চেয়ে কতটা বেশি দামী বিচার করুন! সম্প্রতি টাটা ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের (মুম্বই) বিজ্ঞানীরা ২.৫ মিলিগ্রাম সোনার ন্যানো পার্টিকল ব্যবহার করে বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার ছাড়াই সূর্যালোকের সাহায্যেই ৮৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সমুদ্রের জল থেকে জলীয় বাষ্প উৎপাদন করার টেকনোলজি আবিস্কার করেছেন। এতে উৎপাদন খরচ আরও কমবে এবং ভবিষ্যতে সোনার বদলে অন্য ধাতু ব্যবহার করে উৎপাদন খরচ আরও কমানোর গবেষণা চলছে। (তথ্যসূত্র ঃ TIFR desalinates Seawater without electricity', The Hindu, 14.07.19 এবং 'Is Sea Water the Ultimate answer', The Hindu, 07.07.19). এছাড়া শ্রী প্রভুদান হালদার মহাশয়ের দ্বারা বাসন্তীর উদাহরণও প্রণিধানযোগ্য।

দ্বিতীয়তঃ লবণমুক্ত পরিশ্রুত জলে দ্রবীভূত লবণ কমে যাওয়ায় আবার তাকে পানযোগ্য করার জন্য প্রয়োজনীয় লবণ, CO_2 সংযোগ করতে অনেক খরচ হবে বলে প্রচার আছে। রিভার্স অসমোসিস প্রক্রিয়ায় অতি সহজেই প্রতি লিটার জল মাত্র ৩ পয়সায় উৎপাদন করা হয় এই প্রক্রিয়াসহ। আরও আধুনিক যে প্রযুক্তি আসছে তা উৎপাদন খরচ আরও কমাবে।

তৃতীয়তঃ অভিযোগ হল সমুদ্রের জল শোধনের পর যে প্রবল লবণযুক্ত মাটি পাওয়া যায় তা সমুদ্রে ফেলা হচ্ছে। এতে সমুদ্রের লবণাক্ততা অস্বাভাবিক বেড়ে সমুদ্রপাড়ের প্রচুর উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যু ঘটায়।

এর জবাবে বলা যায় সংগৃহীত লবণ সমুদ্রে ফেলার প্রয়োজন কোথায়? জল উৎপাদনের সাথে লবণ উৎপাদন হলে খরচ আরও কমবে এবং প্রয়োজনে শুধুমাত্র লবণ তৈরির চালু প্লান্ট বন্ধ করে দিতে হবে।

সমগ্র আলোচনার পর পাঠক কি মনে করেন ভারতে সত্যিই এক তীব্র জলসঙ্কট আসন্ন? বিজ্ঞানমনস্ক, সমাজ সচেতন, প্রগতিশীল কোন মানুষই তা মনে করবেন না। সুতরাং নীতি আয়োগ তথা সরকার দ্বারা এবং তাদের সহযোগী পরিবেশবাদীরা 'তীব্র জলসঙ্কট আসন্ন' বলে এক জলাতঙ্কের পরিবেশ দেশজুড়ে সৃষ্টি করছেন তা কৃত্রিম, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এক অপবিজ্ঞানের প্রচার। জলসঙ্কট নিয়ে এই প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য জল নিয়ে যে চালু ব্যবসা চলছে তার বাজার আরও প্রসারিত করা এবং কৃষিপণ্যের বাজারে যে ভয়াবহ মন্দা চলছে সেই মন্দার হাত থেকে পুঁজিপতিশ্রেণীকে রক্ষা করার জন্য ভারতের স্বতঃস্ফূর্ত কৃষির বিকাশের গতি রুদ্ধ করা।

অতএব এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, অপবিজ্ঞানের প্রচারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের আলোকে ব্যাপক জনসাধারণকে সচেতন করতে প্রতিটি বিজ্ঞান মনস্ক মানুষকে পথে নামতে হবে।■

কুসংস্কার টিকিয়ে রাখে কারা ঃ

ইসরো ঃ
কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস টিকিয়ে রাখে কারা ?

ভূমিকা ঃ গত ২২শে জুলাই ২০১৯ ভারতীয় মহাকাশ গবেষনা কেন্দ্র (ইসরো – Indian Space Research Organisation) তার সতীশ ধাওয়ান উৎক্ষেপণ কেন্দ্র শ্রী হরিকোটা থেকে চন্দ্রযান-২ কে রকেটের সাহায্যে উৎক্ষেপণ করল। রকেটের নাম জি. এস. এল. ভি. মার্ক-৩ ওরফে বাহুবলী।

এর আগে ১৫ই জুলাই ভোরে উৎক্ষেপণের সময় নির্দিষ্ট হলেও মাত্র ৫৬ মিনিট ২৪ সেকেন্ড আগে তা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করা হয় অতি-শীতল জ্বালানীর ট্যাঙ্ক এ কিছু ত্রুটি ধরা পড়ায়। উৎক্ষেপনের ঠিক ১৬ মিনিট ১৪ সেকেন্ড পরে ১৮১.৬৫৬ কিলোমিটার উচ্চতায় বাহুবলী রকেট থেকে চন্দ্রযান-২ বিচ্ছিন্ন হয় ও নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপিত হয়। চন্দ্রযান-২ এর ওজন ৩ হাজার ৮৫০ কিলোগ্রাম। তাকে উৎক্ষেপণের জন্য ৬৪০ টন ওজনের রকেট বাহুবলীর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত।

আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর চন্দ্রযানের অংশ ল্যান্ডার – 'বিক্রম' চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করবে। এই অবতরণের চারদিন আগে অবধি অরবিটার এর সাহায্যে সে পৃথিবীর কক্ষপথ থেকে চাঁদের কক্ষপথে স্থাপিত হবে এবং চাঁদের কক্ষপথে গতি কমিয়ে কমিয়ে অবতরণের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করবে। অবতরণের আগেরদিন চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে ৩০ কিলোমিটার উচ্চতায় সে চারদিন ধরে আবর্তন করবে। শেষ পনেরো মিনিটে ৬১২০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা গতিবেগ থেকে ধাপে ধাপে অতিমাত্রায় নিয়ন্ত্রিতরূপে গতি কমিয়ে ঘণ্টায় মাত্র ২.৫ কিলোমিটারের কাছাকাছি নামিয়ে এনে ল্যান্ডারকে অবতরণ করনো হবে। চাঁদের মাটি ছোঁয়ার সাথে সাথে এই ল্যান্ডার এর পায়ে লাগানো সেন্সর এর সাহায্যে ইঞ্জিন বন্ধ করা হবে। গতিবেগ শূন্য হয়ে যাবে। বর্তমান হিসেব অনুযায়ী অবতরণের ৪ ঘন্টা পর চাঁদে সকাল হবে (প্রসঙ্গত চাঁদে টানা ১৪ দিন সূর্যালোক অর্থাৎ দিন ও টানা ১৪ দিন অন্ধকার অর্থাৎ রাত)। 'বিক্রম' নামক ল্যান্ডার এর গর্ভে রয়েছে 'প্রজ্ঞান' রোবট যান বা রোভার। চাঁদে দিন শুরু হলে সোলার প্যানেল এর সাহায্যে 'প্রজ্ঞান' রোভার চন্দ্রপৃষ্ঠে নামবে এবং ১ সেন্টিমিটার প্রতি সেকেন্ড গতিতে পাঁচশো মিটার পর্যন্ত ভ্রমণ করতে পারবে। বিক্রম আর প্রজ্ঞান দুটোরই কার্যকাল ১ চন্দ্রদিবস অর্থাৎ ১৪ দিন। এটাই চন্দ্রপৃষ্ঠে ভারতের দিক থেকে ল্যান্ডার ও রোভার স্থাপন করার প্রথম প্রয়াস। ল্যান্ডার চাঁদে অবতরণ করবে দক্ষিণ মেরুতে। আমেরিকা, রাশিয়া ও চিন কেউই চন্দ্রাভিযানে এই দিকে অবতরণ করায়নি। অবতরণের নির্দিষ্ট স্থানটি দুটি বিকল্পের মধ্যে কোনটা গ্রহণ করা হবে সেটা স্থির করবে ল্যান্ডার নিজেই। ল্যান্ডার চাঁদের ভূকম্প প্রবণতা, তাপমাত্রার তারতম্য পরীক্ষা করবে এবং রোভার প্রত্যক্ষভাবে অবতরণস্থলের আশেপাশের উপাদান সমীক্ষা করবে। এই প্রকল্প আমেরিকার নাসা অথবা অন্যান্য দেশের চন্দ্রাভিযানের তুলনায় সস্তায় হচ্ছে। খরচ আনুমানিক ৯৭৮ কোটি টাকা।

*　　*　　*　　*

চন্দ্রযান-২ উৎক্ষেপণের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে পেশ করা হল এটা বোঝার জন্য যে কি ধরনের সুক্ষ্ম গণনা, অতি উন্নত প্রযুক্তি এবং শয়ে শয়ে বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদের পরিশ্রম ও মেধা যুক্ত হয়ে রয়েছে এ ধরনের উৎক্ষেপণের মধ্যে। এখানে এটাও মাথায় রাখতে হবে প্রথম নির্ধারিত দিনে উৎক্ষেপণ না হওয়ায় সাত দিনের মধ্যে ত্রুটি মেরামত করে উৎক্ষেপণ করা হয়েছে এবং বাড়তি গতি সঞ্চার করে ঐ নির্ধারিত ৭ই সেপ্টেম্বরই চাঁদে সম্ভাব্য অবতরণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু ইসরোর কর্তৃপক্ষ ও প্রকল্পের আধিকারিক এবং বরিষ্ঠ বিজ্ঞানীরা কি নিজেদের জ্ঞান, মেধা ও পরিশ্রম (যা বাস্তবিক) তার প্রতি আত্মবিশ্বাসী? নাকি অন্ধবিশ্বাস আর কুংস্কারের পাঁকে নিমজ্জিত? এটা অলঙ্ঘনীয় রীতি যে রকেট উৎক্ষেপণের আগে তিরুপতির মন্দিরে 'ভগবান বালাজী'র পায়ে রকেটের এক ছোট প্রতিকৃতি (রেপ্লিকা) রেখে পুজো দেওয়া হয় ও ঈশ্বরীয় সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। প্রতিবার এটা করা হয়। যতদিন যাচ্ছে এই প্রথা প্রবলতর হচ্ছে। বর্তমানে ইসরোর চেয়ারম্যান কে. সিবনের খালি গায়ে ধুতি পড়ে উডুপী কৃষ্ণ মঠে পুজো দেবার ছবি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া তিরুমালা ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরে প্রতি উৎক্ষেপণের আগে রকেটের প্রতিকৃতি রেখে পুজো দেওয়া হয়। এখন শ্রীহরিকোটার আশেপাশে বহু

মন্দিরে এই প্রকল্পের কর্তা ও তাদের সহকারীরা পুজো দিয়ে বেড়ান।

রকেটের প্রতিটা স্তর যখন সংযুক্ত হয় পুজো-পাঠ করা হয়। প্রকল্প নির্দেশকদের মধ্যে উৎক্ষেপণের দিন শুচিতা বজায় রাখার জন্য নতুন পোষাক পরে আসার রীতিও আছে।

এই বিজ্ঞানীরা সংখ্যাগত অন্ধবিশ্বাসেও আসক্ত! ইসরোর দ্বাদশ (১২তম) বাণিজ্যিক উৎক্ষেপণ হয় PSLV (পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল) - CI2 রকেটের মাধ্যমে। এর পরবর্তী রকেট যা Ocean sat-2 ও অন্য দুটি ইউরোপীয় ন্যানো স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে তার নাম দেওয়া হয় PSLV C-14। তেরো (13) নম্বরের কোন রকেট নেই। কেন? ইসরো কি তেরো সংখ্যাকে অপয়া মনে করে? কর্তাব্যক্তিরা উত্তর দেননি। বরং নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রাক্তন ইসরো প্রধান বলেছেন 'এটা যার যার নিজস্ব বিশ্বাস, ভগবান আর বিষ এর ক্ষেত্রে ঝুঁকি নেওয়া যায় না। (One cannot take chance with God and poison). মজার বিষয় হল Apollo-13 চাঁদে অবতরণ করতে ব্যর্থ হবার পর আমেরিকার মহাকাশ সংস্থা কোন মিশনেই ঐ সংখ্যা ব্যবহার করেনি।

ভারতে Mars Orbiter Misson (মঙ্গলযান) ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রে উৎক্ষেপণ মঙ্গলবার হয়নি। হয়ত মঙ্গলে পাড়ি দেবে বলে মঙ্গলের দোষ কেটে গিয়েছিল!

আরো চমকপ্রদ তথ্য হল পাঠকমাত্রেই বুঝতে পারবেন চন্দ্রের মাটিতে সম্ভাব্য অবতরণ চন্দ্রদিবসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পৃথিবীর 'শুভ-অশুভ ক্ষণ' এর তত্ত্ব সেখানে খাটবেনা। আন্তঃ গ্রহ মিশনের ক্ষেত্রে তাই পৃথিবী পৃষ্ঠে রকেট উৎক্ষেপণও ঐ নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট গণনা অনুযায়ী করতে হবে। মঘা, অশ্লেষা, রাহুর দশা বিচার করা যাবেনা। সেই দোষ কাটাতে ফিরতি গণনা বা Count down শুরু করা হয় শুভ সময়ে। এবার যেমন রাহুর দশা কাটার পর কাউন্ট ডাউন শুরু করা হয়।

এই বিজ্ঞানীরা ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান করেন। যদি ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁদের প্রশ্ন করেন 'বৈজ্ঞানিক গবেষণা না অলৌকিকতা কোনটা বিশ্বাসযোগ্য, তাঁরা কী উত্তর দেবেন? হয় তারা মিথ্যে বলবেন অথবা যদি সত্যি বলেন তবে সেই সত্যকে তাঁরা নিজেরা অন্ততঃ বিশ্বাস করেন না।

এই ঘটনার বাস্তবতা লুকিয়ে বর্তমান সমাজের অর্থনীতি আর রাজনীতির মধ্যে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার কর্তাব্যক্তিদের কাছে ব্যবসায়ীক স্বার্থটাই প্রধান। যেমন ইসরো একটি রাষ্ট্রায়ত্ব কোম্পানী গঠন করেছে, New Space India Limited (NSIL)। এর উদ্দেশ্য হল ইসরোর গবেষণা ও বিকাশ প্রকল্প (Research and development) কে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা। PSLV ও SSLV (Small Satellite Launch Vehicle) উৎপাদন ও বিপণন করবে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংহ বলেছেন, "NSIL ভারতীয় শিল্পকে ভারতীয় মহাকাশ প্রোগ্রামের যে বাড়তি চাহিদা তার উপযোগী উন্নত প্রযুক্তি প্রস্তুত করা ও উৎপাদন করার উপযোগী করে তুলবে। এর ফলে মহাকাশ ক্ষেত্রে (Space Sector) ভারতীয় শিল্পের বৃদ্ধি এগিয়ে যাবে"। অর্থাৎ এটা স্পষ্ট যে সকল ক্ষেত্রের মত 'Space' বা মহাকাশও হল মুনাফা করার একটা 'ক্ষেত্র'। মহাকাশ সম্বন্ধীয় পণ্য ও পরিষেবার ক্ষেত্রে তুলনামূলক কম খরচের মাধ্যমে NSIL বাজার ধরার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করবে।

এই পরিবেশে বিজ্ঞানীরাও বিজ্ঞানচর্চাকে ও নিজস্ব মেধাকে কেরিয়ার বা ব্যক্তিগত শ্রীবৃদ্ধির সোপান বলেই মনে করার দিকে প্ররোচিত হয়। সার্বিক বৈজ্ঞানিক সচেতনতা, সমাজের প্রতি কর্তব্য এসব কিছুই অভিধানের বাইরে চলে যায়। বিজ্ঞান গবেষণা, চর্চা ও অধ্যয়নের সুনির্দিষ্ট বিষয়কে সার্বিক জ্ঞান ও সমাজের চাহিদা থেকে বিচ্ছিন্ন করা, ক্রমাগত খন্ডিত করার মধ্যে দিয়ে তাঁরা এই চেতনায় পৌঁছন বা পৌঁছতে বাধ্য হন। সমাজে সাধারণ মানুষের মধ্যে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে এরা প্রধান ভূমিকা পালন করেন। তাই এই সমস্যার সমাধান রয়েছে সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাফল্যের মধ্যে।

তবু মেঘাচ্ছন্ন আকাশেও রূপালী রেখা দেখা দেয়। এভাবেই বিজ্ঞান এগিয়ে চলে সত্যের দিকে। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী অধ্যাপক সি. এন. আর রাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন – "কোন মহাকাশ মিশনের আগে তিরুপতি মন্দিরের আশীর্বাদ গ্রহণ কুসংস্কার মাত্র। আমি কুসংস্কারগ্রস্ত নই। জ্যোতিষেও বিশ্বাস করি না। অন্য কোনও ধরনের অন্ধবিশ্বাসেও নয়"। ব্যাঙ্গালোর প্রেস ক্লাবে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন "Human are being scared. They think that if they do offerings, their work will get right. What to do?" (সূত্র 23.11.2013 rediff news)

আমরা আশা করবো নির্ভুল বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের প্রমাণ দিয়ে ৭ই সেপ্টেম্বর চন্দ্রযান-২ চাঁদের মাটিতে অবতরণ করবে।

[তথ্যসূত্র ঃ india news 23.09.2019, 21.07.2019 India today ইত্যাদি]

ইতিহাসের পাতা থেকে ঃ

অপবিজ্ঞান

– রাজশেখর বসু

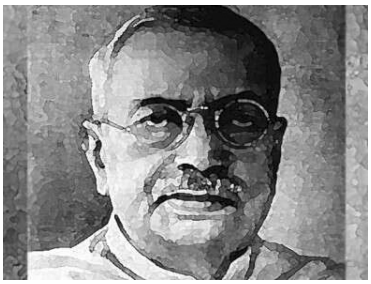

বিজ্ঞান চর্চার প্রসারের ফলে প্রাচীন অন্ধসংস্কার ক্রমশ দূর হইতেছে। কিন্তু যাহা যাইতেছে তাহার স্থানে নূতন জঞ্জাল কিছু কিছু জমিতেছে। ধর্মের বুলি লইয়া যেমন অপধর্মের সৃষ্ট হয়, তেমনি বিজ্ঞানের বুলি লইয়া অপবিজ্ঞান গড়িয়া ওঠে। সকল দেশেই বিজ্ঞানের নামে অনেক নূতন ভ্রান্তি সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক ছদ্মবেশে যে সব ভ্রান্ত ধারণা এদেশে লোকপ্রিয় হইয়াছে, তাহারই কয়েকটির কথা বলিতেছি।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য – বিদ্যুৎ। তীব্র উপহাসের ফলে এই শব্দটির প্রয়োগে আজকাল কিঞ্চিৎ সংযমও আসিয়াছে। টিকিতে বিদ্যুৎ, পইতায় বিদ্যুৎ, গঙ্গাজলে বিদ্যুৎ – এখন বড় একটা শোনা যায় না। গল্প শুনিয়াছি, এক সভায় পন্ডিত শশধর তর্ক চূড়ামণি অগস্ত্যমুনির সমুদ্র শোষণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। অগস্তের ক্রুদ্ধ চক্ষু হইতে এমন প্রচন্ড বিদ্যুৎ শ্রোত নির্গত হইল যে সমস্ত সমুদ্রের জল এক নিমেষে বিশ্লিষ্ট হইয়া হাইড্রোজেন, অক্সিজেনরূপে উবিয়া গেল। সকলে অবাক হইয়া এই ব্যাখ্যা শুনিল, কেবল একজন ধৃষ্ট শ্রোতা বলিল – 'আরে না মশাই, আপনি জানেন না, চোঁ করে মেরে দিয়েছিল'।

বিদ্যুতের মহিমা কমিলেও একেবারে লোপ পায় নাই। কিছুদিন পূর্বে কোনও মাসিক পত্রিকায় এক কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছিলেন – 'সর্বদাই মনে রাখিবেন তুলসীগাছের সর্বত্র নিরন্তর বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চারিত হইতেছে।'এই অপূর্ব তথ্যটি তিনি কোথায় পাইলেন, চরকে কি সুশ্রুতে কিংবা নিজ মনের অন্তস্থলে,তাহা বলেন নাই। বৈদ্যুতিক সালসা বৈদ্যুতিক আংটি বাজারে সুপ্রচলিত। অষ্টধাতুর মাদুলির গুণ এখন আর শাস্ত্র বা প্রবাদের উপর নির্ভর করে না। ব্যাটারিতে দুই রকম ধাতু থাকে বলিয়া বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, অতএব অষ্টধাতুর উপযোগিতা আরও বেশি না হইবে কেন! বিলাতী খবরের কাগজেও বৈদ্যুতিক কোমরবন্ধের বিজ্ঞাপন মারা প্রসংশাপত্র বাহির হইতেছে। সাহেবরা ঠকাইবার বা ঠকিবার পাত্র নয়, অতএব তোমার আমার অশ্রদ্ধার কোনও হেতু নাই। মোট কথা, সাধারণের বিশ্বাস – মিছরি নিম এবং ভাইটামিনের তুল্য বিদ্যুৎ একটি উৎকৃষ্ট পথ্য, যেমন করিয়া হউক দেহে সঞ্চারিত করিলেই উপকার। বিদ্যুৎ কি করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহার প্রকার ও মাত্রা আছে কিনা, কোন রোগে কি রকমে প্রয়োগ করিতে হয়, এত কথা কেহ ভাবে না। আমার পরিচিত এক মালীর হাতে বাত হইয়াছিল। কে তাহাকে বলিয়াছিল বিজলীতে বাত সারে এবং টেলিগ্রাফের তারে বিজলী আছে। মালী এক টুকরা ঐ তার সংগ্রহ করিয়া হাতে তাগা পরিয়াছিল।

উত্তর দিকে মাথা রাখিয়া শুইতে নাই, শাস্ত্রে বারণ আছে। শাস্ত্র কারণ নির্দেশ করে না। সুতরাং বিজ্ঞানকে সাক্ষী মানা হইয়াছে। পৃথিবী একটি প্রকান্ড চুম্বক, মানুষের দেহও নাকি চুম্বকধর্মী – অতএব উত্তরমেরুর দিকে মাথা না রাখাই যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু দক্ষিণমেরু নিরাপদ কেন হইল তাহার কারণ কেহ দেন নাই।

জোনাকিপোকা প্রদীপে পুড়িলে যে ধূয়া বাহির হয় তাহা অত্যন্ত বিষ এই প্রবাদ বহুপ্রচলিত। অপবিজ্ঞান বলে – জোনাকি হইতে আলোক বাহির হয় অতএব তাহাতে প্রচুর ফসফরাস আছে, এবং ফসফরাসের ধূয়া মারাত্মক বিষ। প্রকৃত কথা – ফসফরাস যখন মৌলিক অবস্থায় থাকে তখন বায়ুর স্পর্শে তাহা হইতে আলোক বাহির হয়, এবং ফসফরাস বিষও বটে। কিন্তু জোনাকির আলোক ফসফরাস-জনিত নয়। প্রাণিদেহ মাত্রেই কিঞ্চিৎ ফসফরাস আছে, কিন্তু তাহা যৌগিক অবস্থায় আছে, এবং তাহাতে বিষধর্ম নাই। এক টুকরা মাছে যত ফসফরাস আছে, একটি জোনাকিতে তাহার অপেক্ষা অনেক কম আছে। মাছ-পোড়া যেমন নিরাপদ, জোনাকি-পোড়াও তেমন।

কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক নামের একটা মোহিনী শক্তি আছে, লোকে সেই নাম শিখিলে স্থানে অস্থানে প্রয়োগ করে। 'গাটোপার্চা' এইরকম একটি মুখরোচক শব্দ। ফাউন্টেন পেন, চিরুনি, চশমার ফ্রেম প্রভৃতি বহু বস্তুর উপাদানকে লোকে নির্বিচারে গাটোপার্চা বলে। গাটোপার্চা বরারের ন্যায়

বৃক্ষবিশেষের নিষ্যন্দি। ইহাতে বৈদ্যুতিক তারের আবরণ হয়, জলরোধক বার্নিশ হয়, ডাক্তারি চিকিৎসায় ইহার পাত ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সাধারণত লোকে যাহাকে গোটাপার্চ বলে তাহা অন্য বস্তু। আজকাল যেসকল শৃঙ্গবৎ কৃত্রিম পদার্থ হইতেছে তাহার কথা সংক্ষেপে বলিতেছি ঃ–

নাইট্রিক অ্যাসিড তুলা ইত্যাদি হইতে সেলিউলয়েড হয়। ইহা কাচতুল্য স্বচ্ছ কিন্তু অন্য উপাদান যোগে রঞ্জিত চিত্রিত বা হাতির দাঁতের ন্যায় সাদা করা যায়। ফোটোগ্রাফের ফিল্ম, মোটর গাড়ির জানালা, হার্মোনিয়মের চাবি, পুতুল, চিরুনি, বোতাম প্রভৃতি অনেক জিনিসের উপাদান সেলিউলয়েড। অনেক চশমার ফ্রেমও এই পদার্থ।

রবারের সহিত গন্ধক মিলাইয়া ইবনাইট বা ভল্‌কানাইট প্রস্তুত হয়। বাংলায় ইহাকে 'কাচকড়া' বলা হয়, যদিও কাচকড়ার মূল অর্থ কাছিমের খোলা। ইবনাইট স্বচ্ছ নয়। ইহা হইতে ফাউন্টেন পেন, চিরুনি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

আরও নানাজাতীয় স্বচ্ছ বা শৃঙ্গবৎ পদার্থ বিভিন্ন নামে বাজারে চলিতেছে, যথা-সেলোফেন, ভিসকোজ, গ্যালালিথ, ব্যাকেলাইট ইত্যাদি। এগুলির উপাদান ও প্রস্তুতপ্রণালী বিভিন্ন। নকল রেশম, নকল হাতির দাঁত, নানারকম বার্নিশ, বোতাম, চিরুনি প্রভৃতি বহু শৌখিন জিনিস ঐসকল পদার্থ হইতে প্রস্তুত হয়।

বঙ্গভঙ্গের সময় যখন মেয়েরা কাঁচের চুড়ি বর্জন করিলেন তখন একটি অপূর্ব স্বদেশী পণ্য দেখা দিয়াছিল – 'আলুর চুড়ি'। ইহা বিলাতী সেলিউলয়েডের পাতা জুড়িয়া প্রস্তুত। আলুর সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক নাই। বিলাতী সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে অতিরঞ্জিত আজগবী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের খবর বাহির হয়। বহুকালপূর্বে কোনও কাগজে পড়িয়াছিলাম গন্ধকাম্লে আলু ভিজাইয়া কৃত্রিম হস্তিদন্ত প্রস্তুত হইতেছে। বোধ হয় তাহা হইতেই আলুর চুড়ি নামটি রটিয়াছিল।

আর একটি ভ্রান্তিকর নাম সম্প্রতি সৃষ্টি হইয়াছে – 'আলপাকা শাড়ি'। আলপাকা একপ্রকার পশমী কাপড়। কিন্তু আলপাকা শাড়িতে পশমের লেশ নাই, ইহা কৃত্রিম রেশম হইতে প্রস্তুত।

টিন শব্দের অপপ্রয়োগ আমরা ইংরেজের কাছে শিখিয়াছি। ইহার প্রকৃত অর্থ রাং, ইংরেজীতে তাঁহাই মুখ্য অর্থ। কিন্তু আর এক অর্থ-রাং-এর লেপ দেওয়া লোহার পাত অথবা তাহা হইতে প্রস্তুত আধার, যথা, 'কেরোসিনের টিন'। ঘর ছাহিবার করুগেটেড লোহায় দস্তার প্রলেপ থাকে। তাহাও 'টিন' আখ্যা পাইয়াছে, যথা 'টিনের ছাদ'।

আজকাল মনোবিদ্যার উপর শিক্ষিত জনের প্রবল আগ্রহ জন্মিয়াছে, তাহার ফলে এই বিদ্যার বুলি সর্বত্র শোনা যাইতেছে। Psychological moment কথাটি বহুদিন হইতে সংবাদপত্র ও বক্তৃতার অপরিহার্য বুকনি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্প্রতি আর একটি শব্দ চলিতেছে-complex। অমুক লোক ভীরু বা অন্যের অনুগত অতএব তাহার inferiority complex আছে। অমুক লোক সাঁতার দিতে ভালবাসে, অতএব তাহার water complex আছে। বিজ্ঞানীর দুর্ভাগ্য-তিনি মাথা ঘামাইয়া যে পরিভাষা রচনা করেন সাধারণে তাহা কাড়িয়া লইয়া অপপ্রয়োগ করে, এবং অবশেষে একটা বিকৃত কদর্থ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া বিজ্ঞানীকে স্বাধিকারচ্যুত করে।

মানুষের কৌতুহলের সীমা নাই, সব ব্যাপারেরই সে কারণ জানিতে চায়। কিন্তু তাহার আত্মপ্রতারণার প্রবৃত্তিও অসাধারণ, তাই সে প্রমাদকে প্রমাণ মনে করে, বাক্‌ছলকে হেতু মনে করে। বাংলা মাসিকপত্রিকার জিজ্ঞাসা বিভাগের লেখকগণ অনেক সময় হাস্যকর অপবিজ্ঞানের অবতারণা করেন। কেহ প্রশ্ন করেন – বাতাস করিতে গায়ে পাখা ঠেকিলে তাহা মাটিতে ঠুকিতে হয়, ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি। কেহ বা গ্রহণে হাঁড়ি ফেলার বৈজ্ঞানিক কারণ জানিতে চান। উত্তর যাহা আসে তাহাও চমৎকার। কিছুদিন পূর্বে 'প্রবাসী'র জিজ্ঞাসা বিভাগে একজন প্রশ্ন করিয়াছিলেন মাছির মল হইতে পুদিনা গাছ জন্মায়, ইহা সত্য কিনা। একাধিক ব্যক্তি উত্তর দিলেন – আলবৎ জন্মায়, ইহা আমাদের পরীক্ষিত। এই লইয়া কয়েক মাস তুমুল বিতন্ডা চলিল। অবশেষে মশা মারিবার জন্য কামান দাগিতে হইল, সম্পাদক মহাশয় আচার্য জগদীশচন্দ্রের মত প্রকাশ করিলেন – পুদিনা জন্মায় না।

আর একজন প্রশ্ন করিয়াছিলেন কর্পূর উবিয়া যায় কেন। উত্তর অনেক আসিল, সকলেই বলিলেন কর্পূর উদ্বায়ী পদার্থ তাই উবিয়া যায়। প্রশ্নকর্তা বোধ হয় তৃপ্ত হইয়াছেন, কারণ তিনি আর জেরা করেন নাই। কিন্তু উত্তরটি কৌতুককর। 'উদ্বায়ী'র অর্থ – যাহা উবিয়া যায়। উত্তরটি দাঁড়াইল এই – কর্পূর উবিয়া যায়, কারণ তাহা এমন বস্তু যাহা উবিয়া যায়। প্রশ্নকর্তা যে তিমিরে সেই তিমিরে রহিলেন। একবার এক গ্রাম্য যুবককে প্রশ্ন করিতে শুনিয়াছিলাম – কুইনিনে জ্বর সারে কেন। একজন মুরব্বী ব্যক্তি বুঝাইয়া দিলেন – কুইনিন জ্বরকে জব্দ করে, তাই জ্বর সারে।

কর্পূর উবিয়া যায় কেন, ইহার উত্তরে বিজ্ঞানী বলিবেন – জানি না। হয়তো কালক্রমে নির্ধারিত হইবে যে পদার্থের আণব সংস্থান অমুক প্রকার হইলে তাহা উদ্বায়ী হয়। তখন বলা চলিবে

– কর্পূরের গঠনে অমুক বিশিষ্টতা আছে তাই উবিয়া যায়। কিন্তু ইহাতেই প্রশ্ন থামিবে না, ঐপ্রকার গঠনের জন্যই বা পদার্থ উদ্বায়ী হয় কেন? বিজ্ঞানী পুনর্বার বলিবেন – জানি না।

বিজ্ঞানের লক্ষ্য-জটিলকে অপেক্ষাকৃত সরল করা, বহু বিসদৃশ ব্যাপারের মধ্যে যোগসূত্র বাহির করা। বিজ্ঞান নির্ধারণ করে – অমুক ঘটনার সহিত অমুক ঘটনার অখন্ডনীয় সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ ইহাতে এই হয়। কেন হয় তাহার চূড়ান্ত জবাব বিজ্ঞান দিতে পারে না। গাছ হইতে স্খলিত হইলে ফল মাটিতে পড়ে; কারণ বলা হয় – পৃথিবীর আকর্ষণ। কেন আকর্ষণ করে বিজ্ঞান এখনও জানে না। জানিতে পারিলেও আবার নূতন সমস্যা উঠিবে। নিউটন আবিষ্কার করিয়াছেন, জড়পদার্থ মাত্রই পরস্পর আকর্ষণ করে। জড়ের এই ধর্মের নাম মহাকর্ষ বা gravitation . এই আকর্ষণের রীতি নির্দেশ করিয়া নিউটন যে সূত্র রচনা করিয়াছেন তাহা Law of Gravitaion. মহাকর্ষের নিয়ম। ইহাতে আকর্ষণের হেতুর উল্লেখ নাই। মানুষ মাত্রই মরে ইহা অবধারিত সত্য বা প্রাকৃতিক নিয়ম। মানুষের এই ধর্মের নাম মরত্ব। কিন্তু মৃত্যুর কারণ মরত্ব নয়।

কারণ নির্দেশের জন্য সাধারণ লোকে অপবিজ্ঞানের আশ্রয় লইয়া থাকে। ফল পড়ে কেন? কারণ পৃথিবীর আকর্ষণ। এই প্রশ্নোত্তরে এবং কর্পূরের প্রশ্নোত্তরে কোনও প্রভেদ নাই, হেত্বাভাসকে হেতু বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। তবে একটা কথা বলা যাইতে পারে। উত্তরদাতা জানাইতে চান যে তিনি প্রশ্নকর্তা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশি খবর রাখেন। তিনি বলিতে চান – অনেক জিনিসই উবিয়া যায়, কর্পূর তাঁহাদের মধ্যে একটি; জড়পদার্থ মাত্রই পরস্পরকে আকর্ষণ করে, পৃথিবী কর্তৃক ফল আকর্ষণ তাহারই একটি দৃষ্টান্ত। কিন্তু কারণ নির্দেশ হইল না।

বিজ্ঞানশাস্ত্র বারংবার সতর্ক করিয়াছে – মানুষ যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছে তাহা ঘটনার লক্ষিত রীতি মাত্র, ঘটনার কারণ নয়, laws are not causes। যাহাকে আমরা কারণ বলি তাহা ব্যাপারপরম্পরা বা ঘটনার সম্বন্ধ মাত্র, তাহার শেষ নাই, ইয়াত্তা নাই। যাহা চরম ও নিরপেক্ষ কারণ তাহা বিজ্ঞানীর অনধিগম্য। দার্শনিক স্মরণাতীত কাল হইতে তাহার সন্ধান করিতেছেন।

এই প্রসঙ্গে একটি অতিপরিচিত বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে-অদৃষ্টবাদ বা নিয়তিবাদ। ইহা পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের দান নয়, নিতান্তই ভারতীয় বস্তু। আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত ইহার বিবাদ নাই, কিন্তু সাধারণ লোকে যে অদৃষ্টবাদের আশ্রয় লয় তাহা অপবিজ্ঞান মাত্র।

বহু যুগের অভিজ্ঞতার ফলে মানুষের দূরদৃষ্টি জন্মিয়াছে, অতীত ও ভবিষ্যৎ অনেক ব্যাপারপরম্পরা সে নির্ণয় করিতে পারে। কিসে কি হয় মানুষ অনেকটা জানে এবং সেই জ্ঞানের প্রয়োগ দ্বারা প্রয়োজন সাধন করে। কতকগুলি জাগতিক ব্যাপার আমাদের বোধ্য বা সাধ্য, কিন্তু অধিকাংশই অবোধ্য বা অসাধ্য। প্রথমোক্ত বিষয়গুলি আমাদের 'দৃষ্ট' অর্থাৎ নির্ণেয়, শেষোক্ত বিষয়গুলি 'অদৃষ্ট' অর্থাৎ অনির্ণেয়। যাহা দৃষ্ট তাহাতে আমাদের কিছু হাত আছে, যাহা অদৃষ্ট তাহাতে মোটেই হাত নাই।

নিয়তিবাদী দার্শনিক বলেন – কিসে কি হইবে তাহা জগতের উৎপত্তির সঙ্গেই নিয়মিত হইয়া আছে, সমস্ত ব্যাপারই নিয়তি। মানুষের সাধ্য অসাধ্য সমস্তই নিয়তি, আমরা নিয়তি অনুসারেই পুরুষকার প্রয়োগ করি। কাজ সহজে উদ্ধার হইয়া গেলে নিয়তির কথা মনে আসে না। কিন্তু চেষ্টা বিফল হইলেই মনে পড়ে, নিয়তি মানুষের অবাধ্য, যত্ন করিলেও সব কাজ সিদ্ধ হয় না।

বিজ্ঞানও স্বীকার করে – এই জগৎ নিয়তির রাজ্য, সমস্ত ঘটনা কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত অখন্ডনীয়রূপে নিয়ন্ত্রিত। অভিজ্ঞ ব্যক্তি কোনও কোনও বিষয়ের ভবিষ্যদুক্তি করিতে পারেন, যথা – অমুক দিন চন্দ্রগ্রহণ হইবে, অমুক লোকের শীঘ্র জেল হইবে। প্রাকৃতিক নিয়ম বা নিয়তির কিয়দংশ তাঁহার জানা আছে বলিয়াই পারেন। বিচক্ষণ দাবা খেলোয়াড় ভবিষ্যতের পাঁচ-ছয় চাল হিসাব করিয়া ঘুটি চালিয়া থাকে। কিন্তু যাহা মানুষের প্রত্যক্ষ বা অনুমানগম্য তাহা সকল ক্ষেত্রে সাধ্য বা প্রতিকার্য নয়। আমাদের এমন শক্তি নাই যে চন্দ্রের গ্রহণ রোধ করি, কিন্তু এমন শক্তি থাকিতে পারে যাহাতে অমুকের কারাদন্ড নিবারণ করা যায়। এমন প্রাজ্ঞ যদি কেহ থাকেন যিনি সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়ম জানেন, তবে তিনি সর্বদ্রষ্টা ত্রিকালজ্ঞ। তাঁহার কাছে নিয়তি 'অদৃষ্ট' নয়, দৃষ্ট ও স্পষ্ট। তিনি মানুষ, তাই সর্বশক্তিমান হইতে পারেন না, কিন্তু অন্য মানুষের তুলনায় তাঁহার সাধ্যের সীমা অতি বৃহৎ। জ্ঞানবৃদ্ধির ফলে মানবসমাজ এইরূপে উত্তরোত্তর অনাগতবিধাতা হইতেছে।

কুট তার্কিক বলিবেন – প্রকৃতির অখন্ডনীয় বিধি মানিব কেন? তোমার আমার বুদ্ধিতে ফল মাটিতে পড়ে, যথাকলে চন্দ্রগ্রহণ হয়, দুই আর তিনে পাঁচ হয়। কিন্তু এমন ভুবন বা এমন অবস্থা থাকিতে পারে যেখানে বিধির ব্যতিক্রম হয়। বিজ্ঞানী উত্তর দেন – তোমার সংশয় যথার্থ। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্র এই চিরপরিচিত ভুবন এবং তোমার আমার তুল্য প্রকৃতিস্থ মানুষের দৃষ্টি। যখন অন্য ভুবনে যাইব বা অন্য প্রকার দেখিব

● *শেষাংশ ৩৫ পৃষ্ঠায় দেখুন*

ধারাবাহিক নিবন্ধ ঃ

চতুর্থ পর্ব

মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ

– হরি রাম আহমেদ

১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর (নতুন ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী) ইংলন্ডের লিঙ্কনশায়ারের অন্তর্গত উল্‌সথ্রোপ অঞ্চলে আইজ্যাক নিউটনের জন্ম হয়।

নিউটনের জন্মের কয়েকবছর পর (১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে) ইংলন্ডে সংসদীয় রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে অলিভার ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে প্রজাতান্ত্রিক ধাঁচের শাসনকাঠামো প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম শুরু হয়। আমরা আগেই উল্লেখ করেছিলাম যে, বিজ্ঞানী হার্ভে সেই সময় রাজার পক্ষ নিয়েছিলেন। এই কালসন্ধিক্ষণে নিউটন ছিলেন নিতান্তই বালক। তিনি জন্মের তিনমাস আগেই পিতৃহারা হন। নিউটনের গর্ভধারিনী মা, তার জন্মের কিছুকাল পর সন্তানকে দিদিমার কাছে রেখে বাড়ি ছেড়ে চলে যান। তিনি গৃহত্যাগ করে আরেকটি বিয়ে করে নেন। ফলশ্রুতিতে মানবিক অনুভূতি হিসেবে বাবা-মার অপত্যস্নেহ থেকে তিনি বঞ্চিত হন। জন্মস্থানের প্রতি টান, মায়ের প্রতি ভালোবাসা – কোন কিছুই তাঁর জীবনে ছিল না। স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর থেকে তিনি থাকতেন পৈতৃক বাড়ি থেকে দশ কিলোমিটার দূরে ক্লার্ক নামক এক ওষুধ বিক্রেতার দোকানে। এই ওষুধ ব্যবসায়ীর কাছেই তাঁর বিজ্ঞান শিক্ষার হাতেখড়ি। মা সাহায্য না করায় তিনি 'সাইজার' হিসাবে কাজ করে পড়ার খরচ যোগাতেন। যাই হোক, এভাবেই পড়াশুনো করে ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নিউটন স্নাতক হন ট্রিনিটি কলেজ থেকে। তখন তাঁর বয়স তেইশ বছর।

ইতিমধ্যে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে আবার ইংলন্ডের রাজনীতিতে পালাবদল হল। আবার স্টুয়ার্ট বংশের দ্বিতীয় চার্লস রাজা হলেন। ফলে রাজতান্ত্রিক সংসদীয় শাসনব্যবস্থা ইংলন্ডে আবার ফিরে আসে। নিউটন যখন স্নাতক হন, তখন অর্থাৎ ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডন শহরে হঠাৎ প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। এই সময় এমন অবস্থা হয়েছিল যে নিউটন লন্ডন ছাড়তে বাধ্য হলেন। তিনি একরকম বাধ্য হয়েই লিঙ্কনশায়ারের পৈতৃক বাড়িতে এসে বসবাস শুরু করলেন।

আমরা নিউটন আর আপেল গাছ নিয়ে প্রচলিত যে গল্প শুনে থাকি তার সময়কাল এই পর্যায়ই। গাছ থেকে আপেল নীচে পড়া দেখেই তিনি নাকি মহাকর্ষসূত্র আবিষ্কার করেছিলেন – এমন অতিসরল ঘটনা এটা নয়। নিউটনের অনেক আগে থেকেই পতনশীল বস্তু সম্পর্কিত ধারণা ছিল মানব মনে। অ্যারিস্টটল ভুল করলেও এটা বলেছিলেন যে, পতনশীল বস্তুর অভিমুখ নিম্নমুখী। গ্যালিলিও আবার পতনশীল বস্তুর ত্বরণ পরীক্ষা করে পেয়েছিলেন। তাই এই পূর্বপুরুষদের ধারণার ক্রমবিকাশ নিউটনের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। নিউটন এসব নিয়ে এইসময় বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা করছিলেন। এই সময় বাগানে বসে চিন্তাশীল অবস্থায় থাকাকালীন গাছ থেকে একটা আপেল পড়ে বলে কথিত আছে। নিউটনের সমসাময়িক বিজ্ঞানী রবার্ট হুকও মহাকর্ষ সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে গবেষণা করছিলেন, যদিও তখনও তারা পরস্পর অপরিচিতই ছিলেন।

নিউটনের পূর্বেকার বৈজ্ঞানিকদের গবেষণায় গণিতের ব্যবহার ছিল সীমিত। নিউটন সারা জীবনে প্রকৃতিতে ঘটে চলা নানা ঘটনার যে বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন করেছেন, সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে চর্চা, নানা প্রকার ধারণা (যা অনেক ক্ষেত্রেই একই সিদ্ধান্তে এনে দাঁড় করায়) আগে থেকেই ছিল। কিন্তু সেগুলি প্রায় পুরোটাই গণিত বর্জিত ছিল। যেমন ছোট একটা উদাহরণ হিসাবে বলা যায় মহাকর্ষ সূত্র। রবার্ট হুক দাবি করেছিলেন যে, এসব তিনিও বলেছেন আগে থেকে। কিন্তু মহাকর্ষ সূত্রের গাণিতিক সমীকরণের দ্বারা ব্যাখ্যা আগে ছিল না। নিউটনের অনেক আবিষ্কারের মধ্যে গতিবিদ্যা একটা অখন্ড স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তায় উপস্থিত হল গণিতের সহযোগিতায়। তার গতিবিদ্যার সূত্রগুলি এমন অবিচ্ছিন্ন অখন্ড হয়ে উপস্থিত হল যে, একটার থেকে অন্যটায় আন্তসম্পর্কযুক্ত এক ক্রমান্বয় ধারায় তা যেন বিকশিত হয়েই চলল। এ বিষয়টা কিছু সময়ান্তরে আপনাদের কাছে তুলে ধরা হবে। এখন যেটা উল্লেখ করে যাচ্ছি, যে বীজগণিতের প্রয়োজনীয় বিকাশ ঘটিয়ে (নিউটন বাইনোমিয়াল থিয়োরেমের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন) এবং সর্বোপরি গণিতের এক নতুন শাখা ক্যালকুলাসের জন্ম দিয়ে 'গণিত' নামক বিজ্ঞানীদের ভাষাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিলেন। তিনি শুধু এখানেই থেমে থাকলেন না, তাঁর হাত ধরে গণিতের তাৎপর্য গেল পাল্টে। আমরা এই জগতের যতদূর পর্যন্ত দেখতে পেয়েছি, তার থেকেও আরো অনেক দূরের বস্তু জগৎ সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব হল। নিউটনের আগমণের ফলে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মতো গণিত এই প্রথম একটা যন্ত্রের মতো কাজ করলো।

পদার্থবিদ্যায় গণিতের তাৎপর্য কেবলমাত্র নিউটনের হাত ধরেই পরিবর্তিত হয়েছিল এরকম ধারণায় আমরা যেন না আসি। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তি নিউটনের অবদান যেমন স্বীকার্য, তেমনি এই মানুষই মানুষের ইতিহাসের এক বিশেষ পরিস্থিতির ফসল, সেকথাও অনস্বীকার্য। পাশাপাশি ইতিহাস কিন্তু কেবলমাত্র এক যুগপুরুষ হিসাবে তাঁকেই এই দায়িত্ব দিয়েছিল এমনটাও নয়। অন্যান্য অনেক বিষয়গুলির (যার কমবেশি আমরা আগে চর্চা করলাম) মতো এই 'ক্যালকুলাস' নামক গণিতের শাখার জন্মদাতার তালিকায় নিউটনের পাশে জার্মান বিজ্ঞানী উইলথেলম্ লিবনিজের নামও থাকবে। এখান থেকেই আরো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, মানব সমাজের প্রগতির পথে সমাজে যে চাহিদার সৃষ্টি হচ্ছিল তা পূরণ করার তাগিদাটাও কমবেশি সামাজিক। ব্যক্তির বিশেষ অবদান এই যে, সেই ব্যক্তি সমাজের চাহিদার বোঝাটা নিজের কাঁধে তুলে নেন এবং তিনিই সফল হন যাঁর কাঁধটা বেশ চওড়া। পদার্থ বিজ্ঞানে গণিতের এই বিশেষ তাৎপর্য আমরা আগামী পর্বে তুলে ধরবো। আপাতত আমরা নিউটন এক সামাজিক ব্যক্তি হিসেবে কী কী ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়েছেন, মূলতঃ সে বিষয়ে ফিরে যাই।

নিউটন লিঙ্কনশায়ারে থাকাকালীন আলো নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। নিউটনের আগে থেকেই আলো নিয়ে মানুষের নানা রকম প্রশ্ন ছিল। আলো, শব্দ-তাপের মতো শুধু শক্তি নয়। মানুষ আলোকে নানা অর্থে ব্যবহার করেছে। শিক্ষার

আলো নিয়ে পরীক্ষারত নিউটন

আলো, জ্ঞানের আলো। কোনো বিষয় জানতে গিয়ে সে বিষয় আলোকপাত করার কথা আমরা বলে থাকি। আলো সোজা পথে চলে, বাঁকা পথে নয় – এটা আমরা আলোকিত বস্তুর ঠিক পিছনে থাকা ছায়া দেখে সহজেই বুঝতে পারি। মাঝখানে দেওয়াল দিয়ে আলাদা করা দুটি ঘরের এক ঘর থেকে জোরে কথা বললে, অন্য ঘরে শোনা যায়। কিন্তু এক ঘরে আলোকিত বস্তুর আলো, মাঝখানে দেওয়াল থাকায় অন্য ঘরে পৌঁছায় না। কিন্তু এমন কিছু মাধ্যম আছে, যার মধ্যদিয়ে আলো যেতে পারে। যেমন বাতাস, জল বা ঐরকম বস্তু। আমরা এদের বলি স্বচ্ছ বস্তু বা অর্ধ স্বচ্ছ বস্তু। জলে ডুবন্ত পেন্সিল বাইরে থেকে দেখলে বাঁকা মনে হয়। এটা হয় আলো বায়ুমাধ্যম থেকে জল মাধ্যমে যাওয়ার সময় এই দুই মাধ্যমের সংযোগকারী তলে বেঁকে যাওয়ার ফলে। আলো এক নির্দিষ্ট মাধ্যমে সোজা গেলেও অন্যমাধ্যমে প্রবেশ করলে দিক পরিবর্তন করে। একে আলোর প্রতিসরণ বলে। এ বিষয়টা আবিষ্কার করেছিলেন ফরাসি বিজ্ঞানী পিয়ের দ্য ফের্মা। তিনি নিউটনের ট্রিনিটি কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার বছরে মারা যান। আলো এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাওয়ার সময় কতটা বাঁকবে তা নির্ভর করবে নতুন মাধ্যমের দ্বারা আলো কতটা বাধার সম্মুখীন হবে। নতুন মাধ্যমের বাধা টপকিয়ে সবথেকে কম সময়ে আলোকে যেতে হলে ঠিক যতটুকু বাঁকার দরকার, আলো ততটুকুই বেঁকে যায়।

আলোর প্রতিসরণ

[উপরের চিত্রে প্রথম মাধ্যম থেকে আলো দ্বিতীয় মাধ্যমে যাচ্ছে A বিন্দু থেকে B বিন্দুতে প্রথমে AC, তারপর CB পথে। যদি আলোর চলার AC' এবং $C'B$ হতো তবে সেটা প্রথম মাধ্যমে ক্ষুদ্রতম দূরত্ব হতো। কিন্তু দ্বিতীয় মাধ্যমে আলোকে $C'B$ দূরত্ব অতিক্রম করতে হতো।

সেখানে $C'B \rangle CB$ (অর্থাৎ আলোকে অনেক বেশি বাধার সম্মুখিন হতে হতো) যদি আলো AC'' এবং $C''B$ পথে যেত, তবে $C''B \langle CB \langle C'B$ হলে $AC'' \rangle AC \rangle AC'$ অর্থাৎ এক্ষেত্রে আলো'কে প্রথম মাধ্যমে সবথেকে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করত হতো, বা অন্যভাবে বললে বেশি বাধা অতিক্রম করতে হতো। তাই আলো বিজ্ঞানী ফের্মা'র মতে AC, CB পথে যাবে।]

আলোর এই ধর্ম দেখে নিউটনের ধারণা হয়েছিল যে আলোক শক্তি আদতে বস্তুকণার প্রবাহ, যাকে তিনি করপালস

বলে উল্লেখ করেছিলেন। কারণ বস্তুকণাইতো কোনো কিছুর মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় বাধার মুখোমুখি হয়। নিউটন এইবার তেশিরা কাঁচ (প্রিজম)-এর মধ্য দিয়ে সাদা আলো পাঠিয়ে দেখালেন, এই সাদা আলো আসলে অনেকগুলি রঙের আলোর সমষ্টি। অর্থাৎ সাদা আলোর এক একটা কণা হবে অনেকগুলি রঙের আলোর সমষ্টি। তেশিরা কাঁচের চিত্র নিচে দেওয়া হল।

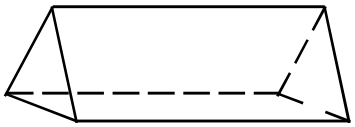

তেশিরা কাঁচ

নিউটন একটা সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট পিচবোর্ডের মধ্য দিয়ে সরু একটা সাদা আলোর স্রোতকে তেশিরা কাঁচের মধ্য দিয়ে পাঠালেন। এই পরীক্ষার ফলে সাদা আলো অনেকগুলি রঙে ভেঙে গেল। মোটামুটি সেগুলি হল লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ, নীল, আকাশি আর বেগুনি।

কোথা থেকে এই সকল রং এলো? এক্ষেত্রে দুই রকম সম্ভাবনা থেকে যায়। প্রথমতঃ এসব সাদা আলোর মধ্যেই ছিল। দ্বিতীয়তঃ এসব কাঁচ থেকে তৈরী হল। এই দুই সম্ভাবনার মধ্যে কোনটি ঠিক, তা জানার জন্য নিউটন আরেকখানা পরীক্ষা করলেন।

নিউটন এই দ্বিতীয় পরীক্ষায় একই মাপের আর একটা তেশিরা কাঁচ নিলেন। প্রথম কাঁচটা থেকে বার হয়ে আলো যেখানে যাচ্ছিল, সেখানে ধরলেন ঐ দ্বিতীয় কাঁচটি। তবে,

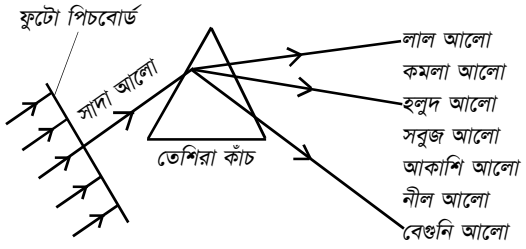

নিউটনের প্রথম পরীক্ষা (সাদা আলোতে নানা রং)

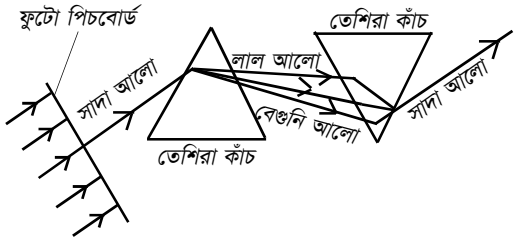

নিউটনের দ্বিতীয় পরীক্ষা (দুটি তেশিরা কাঁচ এভাবে ধরলে দুটোর ফলাফলে শেষে সাদা আলো নির্গত হয়)

এটাকে উল্টো করে (দ্রষ্টব্য নিউটনের দ্বিতীয় পরীক্ষার ছবি)। প্রথম কাঁচের মধ্যদিয়ে যাওয়ার পরে যে একগুচ্ছ রঙিন আলোর ব্যান্ড পাওয়া গেছিল, তা আবার দ্বিতীয় কাঁচের মধ্যদিয়ে পার হয়ে সাদা আলোতে রূপান্তরিত হল। কাঁচ যদি রং তৈরী করতো তবে তো এমন ঘটনা হতো না। এর থেকে নিউটন সিদ্ধান্ত নিলেন যে, প্রথম কাঁচের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরে যে রঙিন আলো আমরা পেলাম, তা আসলে সাদা আলোর মধ্যেই ছিল। বাতাস থেকে কাঁচের মধ্যে যাওয়ার সময় এক এক রঙের আলো এক এক রকম বেঁকে যায়। তাই কাঁচের বাইরে বেরোবার পরে রংগুলিকে দেখা যায় আলাদা আলাদা।

কাঁচটা চারচৌকা হলে এমন হোত না। তেশিরা কাঁচের বেলা যে পিঠ দিয়ে আলো ঢুকছে আর যে পিঠ দিয়ে বেরোচ্ছে, সে দুটো পিঠ এক দিকে হেলে নেই। তাই এক দিক থেকে ঢোকার সময় নানা রঙের আলো যেভাবে বেঁকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে, অন্যদিক থেকে বেরোবার সময় তা কাটাকুটি তো হচ্ছেই না। বরং বিভিন্ন রঙের মধ্যে তফাৎ আরো বেড়ে যাচ্ছে। তাই সাদা আলো থেকে অনেকগুলি রঙ দেখতে পাচ্ছি।

নিউটনের সমসাময়িক ডেনমার্কের বিজ্ঞানী খ্রিস্টিয়ান হয়গেন্স কিন্তু ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে দেখিয়েছিলেন যে, শব্দ যেমন শক্তি, যা তরঙ্গের আকারে এক জায়গা থেকে অন্যত্র যায়, তেমনি আলোও শক্তিরূপে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তরঙ্গের আকারে প্রবাহিত হয়।

১৬৬৭ খ্রীস্টাব্দে নিউটন কেমব্রিজে প্রত্যাবর্তন করেন। আরো দুবছর পর তিনি কেমব্রিজ গণিতের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রয়াল সোসাইটির সদস্যপদ লাভ করেন। সেইসময় রয়াল সোসাইটির কিউরেটর ছিলেন রবার্ট হুক। তিনিও সে সময় আলো নিয়ে গবেষণা করছিলেন। বিজ্ঞানী হয়গেন্সের আলোকে তরঙ্গরূপে দেখার অন্যতম কারণ ছিল এই যে সেটা শক্তি। তিনি চিত্রের সাহায্যে দেখালেন যে, আলো তরঙ্গ হয়েও তার প্রতিফলন, প্রতিসরণ এমনকি তার বিভিন্ন রঙের কারণও ব্যাখ্যা করা যায়। নিউটনের সমকালেই আলোকে বস্তুকণারূপে এবং তরঙ্গরূপে বিচার করার দুই রকমই যুক্তি একসাথে বিদ্যমান ছিল। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখার দরকার যে, সাদা আলোর যে সাতটা রঙের নাম উল্লেখ করা হয়েছে; তাদের মধ্যবর্তী অসংখ্য অন্য রঙ রয়েছে। এর মানে এই যে সাদা আলো (যা কিনা হয় তরঙ্গ নয় বস্তুকণা) তার রকম অসংখ্য।

রবার্ট বয়েল শূন্যস্থানে ঘড়ির শব্দ শুনতে পান নি। 'শব্দ' শক্তি যেমন মাধ্যম ছাড়া একস্থান থেকে অন্যত্র ছড়িয়ে যেতে পারে না, তেমনি 'আলো' শক্তি হলে তা শূন্যস্থানে কীভাবে

প্রবাহিত হতে পারে? এই কারণে হয়গেন্স কল্পনা করলেন এমন একটা মাধ্যমের অস্তিত্ব, যা বিশ্বে সকল স্থানে এবং সকল বস্তুর ভিতরে পরিব্যাপ্ত আছে। এই মাধ্যমের নাম তিনি দিলেন 'ইথার'।

নিউটনের আলো নিয়ে গবেষণাপত্র প্রকাশ করার মতো আর্থিক সামর্থ্য তখন ছিল না। তিনি রয়াল সোসাইটির কিউরেটরকে এই গবেষণাপত্র পাঠান, যাতে তাঁর বই প্রকাশের জন্য সহযোগিতা ও সমর্থন পাওয়া যায়। রবার্ট হুক নিউটনের গবেষণাপত্রে উৎসাহ দেখালেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন এই গবেষণাপত্র প্রকাশ করবেন। কিন্তু গবেষকের নামের জায়গায় নিউটনের বদলে নিজের নাম বসাতে ইচ্ছুক হয়ে ওঠেন। একাজ তিনি করতে চান শুধু এইজন্য নয় যে তার ক্ষমতাবল বিজ্ঞানী সমাজে অনেক বেশি ছিল। তিনি মনেও করতেন যে নিউটনের আলো সম্পর্কিত ধারণা নতুন নয়; এসব তিনি অনেক আগেই জানতেন। তিনি জনসমক্ষে সেই গবেষণাপত্র প্রকাশ করলে নিউটন নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। ছোটবেলা থেকেই বঞ্চনার স্বীকার হয়ে এসেছেন। শৈশবে বাবা-মার স্নেহ থেকে বঞ্চিত, স্কুলে গিয়ে নিজ খরচে পড়াশুনো করা; কলেজে পড়াশুনোর সময়ও কাজ করে খরচ যোগাতে হত। তাই এবারের বঞ্চনায় অবাক হন নি বোধ হয়। শুধু একটা দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে কলেজে পড়ানো আর নিজের চেষ্টায় গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার দরকার – এমন একটা জিদ তাঁকে পেয়ে বসেছিল। গবেষক নিউটন অন্ত রালে চলে গেলেন। এই সময় আলোর বর্ণবিশ্লেষণ জানা থাকায় তিনি এমন একটা দূরবীণ দিয়ে বৃহস্পতির উপগ্রহ দেখলেন।

নিউটন কলেজে পড়াকালীন লন্ডনের একটা কফি শপে মাঝে মাঝেই যেতেন। এখানে তাঁর সাথে বন্ধুত্ব হয় বারো বছর কম বয়সী এডমন্ড হ্যালির সঙ্গে। হালি ছিলেন সে যুগের একজন উদ্যোগপতি। তিনি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানেও প্রবলভাবে উৎসাহী ছিলেন। নিউটনের আলো নিয়ে গবেষণাপত্র সম্পর্কে এবং তাকে রবার্ট হুক যেভাবে নিজের নামে জনসমক্ষে প্রচার করেছিলেন, তার সম্পর্কে হ্যালি পুরোপুরি অবগত ছিলেন। এডমন্ড হ্যালি প্রকৃতিকে আবিষ্কার করার তাগিদ থেকে বিচিত্র সব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তিনি সমুদ্রের গভীরে গিয়ে সামুদ্রিক সম্পদের খোঁজ করার জন্য এমন যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন যার সাহায্যে ঘন্টাচারেক সমুদ্রের তলদেশে থাকা যায়। হ্যালি আকাশের গ্রহ-ধূমকেতুর গতিপথ পর্যবেক্ষণ করতেন। আকাশের জ্বলন্ত ধূমকেতুর গতিপথের পূর্বাভাসের অনুসন্ধান করতে গিয়ে আশি বছর আগেকার যোহান কেপলারের আবিষ্কার সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে পড়েন। আগেই বলেছি যে কেপলার গ্রহদের ঘূর্ণনপথ উপবৃত্তাকার বলেছিলেন। সেই গতিপথের সংরক্ষণ সূত্র আবিষ্কার করে কেপলার সূর্যকে প্রদক্ষিণরত গ্রহের বা ধূমকেতুর ঘূর্ণনের নিয়ম বলে দিলেও এমন কোনো গাণিতিক সমীকরণ সূত্র তখনও আবিষ্কার হয়নি, যার মাধ্যমে এদের গতিপথ খুব নির্দিষ্ট করে নিশ্চিৎভাবে আগে থেকে বলে দেওয়া যাবে। কিন্তু এমনটা নিশ্চয় করা সম্ভব, এমনই হ্যালি মনে করতেন। রবার্ট হুকের থেকে এসবের উত্তরে হ্যালি সন্তুষ্ট ছিলেন না। এ সমস্ত বিষয় ঐ কফি শপে অগ্রজ বন্ধু নিউটনের সাথে আলাপ হত মাঝে মাঝেই।

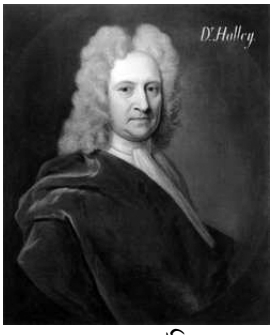

এডমন্ড হ্যালি

খোঁজ করতে করতে একদিন হ্যালি নিউটনের বাসাটা খুঁজেই বের করে ফেললেন। সাক্ষাৎকালে হ্যালি কফি শপের আলাপচারিতার প্রসঙ্গ তুললে, নিউটন তাঁকে যে চিনতে পেড়েছেন, সে বিষয় নিশ্চিত করেন। হ্যালি তাঁর আগমণের কারণ বলেন। আকাশের গ্রহরাজি যে কক্ষপথে ঘোরে, তাদের কোনো গাণিতিক ব্যাখ্যা কী আছে, যা দিয়ে তাদের অবস্থান সম্পর্কে পূর্বানুমান করা যাবে? – এমনটাই অনেকটা ছিল তাঁর প্রশ্ন নিউটনের কাছে।

নিউটন তাঁকে বলেন যে, তিনি এবিষয় অনেক আগেই কিছু কাজ করেছিলেন। হ্যালি চমৎকৃত হন এবং এই গবেষণাপত্র দেখতে চান। বিত্তবান হ্যালির আর্থিক সামর্থ ছিল এমন বিষয়ক পুস্তক প্রকাশ করানোর। নিউটন তাঁকে পরে গবেষণাপত্র পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। বন্ধু বিজ্ঞানী হ্যালির কাছে এই গবেষণাপত্র তিনটি খন্ড একে একে পৌঁছে গেল। হ্যালির নিজের খরচে প্রকাশ করলেন, পদার্থ বিজ্ঞানের যুগান্ত কারী পুস্তক 'ফিলোসফিক ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা'; সংক্ষেপে পৃথিবীর মানুষ যাকে 'প্রিন্সিপিয়া' বলে জানে। এই বই প্রকাশিত হওয়ার পর রবার্ট হুকের সাথে নিউটনের সংঘাত তীব্র হল। হুক দাবি করলেন যে, নিউটন তাঁর কাছে প্রাপ্ত সাহায্যকে যথেষ্ট মর্যাদা দেন নি এবং কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেন নি। অনেককাল পরে অ্যালেক্সিস ক্লেয়ারাট নামক একজন লেখক মন্তব্য করেছিলেন – 'যে সত্যের ঝলক হুক দেখেছিলেন, সেই সত্যকেই নিউটন গাণিতিক ব্যাখ্যা দ্বারা সমৃদ্ধ করেছিলেন।'

আগেই বলেছি পদার্থ বিজ্ঞানে গণিত যে নতুন মাত্রা সংযোগ করেছিল (গণিত বিজ্ঞানের শুধু ভাষা নয়। এটা একটা যন্ত্র হয়ে গেছিল) নিউটন ও তাঁর সমসাময়িকদের হাত ধরে, তার

সম্পর্কে আগামী পর্বে আলোচনা করবো। তাই প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থের সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণায় যাচ্ছি।

প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থের ছিল মোট তিনটি ভাগ। প্রথম ভাগে ছিল বিখ্যাত তিনটি গতিসূত্র। এই তিনটি গতিসূত্র অবশ্যই জড় সাপেক্ষ কাঠামোর বস্তুর গতীয় অবস্থার সূত্রাবলী। প্রথম গতিসূত্রে, বাইরে বাধা বা বল প্রযুক্ত না হলে কোনো বস্তু বা বস্তুর তন্ত্রে (system) [যদি একই অবস্থায় থাকে] গতীয় অবস্থার অপরিবর্তনশীলতাকে তুরে ধরা হয়েছে। কিন্তু বাইরের বলের প্রভাবে কী হবে ? তার উত্তর দ্বিতীয় সূত্রে দিয়েছে। প্রযুক্ত বলের সাথে বস্তুর গতি ও অবস্থার পরিবর্তনকে তিনি ভরবেগের পরিবর্তন দিয়ে বুঝিয়েছেন। তৃতীয় গতিসূত্র ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বলের ব্যাখ্যা আছে। সব মিলিয়ে গতিশীল বস্তুর গতীয় অবস্থার সংরক্ষণ সূত্র, এই গতিসূত্রগুলির মধ্যে নিবন্ধ আছে। এ সম্পর্কে বোঝার ক্ষেত্রে গণিতের প্রয়োজন। এবিষয়ে না গিয়ে এই পর্বে আমরা উল্লেখ করে যাচ্ছি যে, বস্তুর গতির সংরক্ষণ সূত্রই শুধু নয় এই বই-এর তৃতীয়ভাগে তিনি যে মহাকর্ষীয় সূত্র দিয়েছেন, তার সাথে গতিসূত্রগুলির আর্ন্তসম্পর্ক আমরা পাবো। এছাড়া কেপলারের আবিষ্কৃত সংরক্ষণসূত্রের গাণিতিক ব্যাখ্যাও পাবো। এই বই-এর দ্বিতীয়ভাগে আছে তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের গতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা।

নিউটনের মহাকর্ষসূত্র আমাদের এক মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের সন্ধান দিল যার নাম 'G'।

এই বই প্রকাশের পরই আন্তর্জাতিক মহলে নিউটনের কদর অনেকগুণ বেড়ে গেল। কিন্তু রবার্ট হুকের সাথে নিউটনের মনোমালিন্য প্রকট হয়ে উঠল। নিউটন বিরক্ত হয়ে রয়াল সোসাইটি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন।

ওদিকে 'প্রিন্সিপিয়া' প্রকাশিত হওয়ার পর ইংলন্ডের রাজা হ্যালিকে তিনটি সামুদ্রিক অভিযানের সুযোগ করে দিলেন। ব্রিটিশ নৌবাহিনীর জন্য নতুন সামুদ্রিক রাস্তা খোঁজার উদ্দেশ্যও এর অন্তরালে ছিল। হ্যালি এই অভিযানের ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের প্রথম নকশা বানান। এই সময়ই তিনি পৃথিবীর আবহাওয়ার-বায়ুপ্রবাহের ম্যাপ তৈরী করেছিলেন, যা আজও আমরা ব্যবহার করি। এসবের পিছনের বিজ্ঞান নিউটনেরই আবিষ্কৃত বস্তুজগতের বিজ্ঞানে রয়েছে। এডমন্ড হ্যালিকে পৃথিবী যে কারণে বিশেষ করে মনে রেখেছে, তা হল একটি ধূমকেতুর নামকরণের সাথে। এই ধূমকেতুর সঠিক গতিপথ, তার আগামী অবস্থান, পৃথিবী থেকে ঠিক কত সময়ান্তরে তাকে দেখা যাবে, তা এবার নির্ণীত হল।

১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলন্ডে আবার বিপ্লবী উত্থান হয়েছিল। সংসদ সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজা দ্বিতীয় জেমস্ -কে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। ইতিহাসে এই অধ্যায় গৌরবময় বিপ্লব (গ্লোবিয়াস রেভল্যুশন) বলা হয়ে থাকে। সংসদ সিদ্ধান্ত নেয় যে, এখন থেকে অধিকার বলে গ্রেট ব্রিটেনে কেউ রাজা হবেন না। সংসদই সিদ্ধান্ত নেবে কে রাজা বা রানী হবেন। যদিও রাজতন্ত্র পুরুষানুক্রমিক। তা না হলে তো রাজতন্ত্রই থাকে না। সব মিলিয়ে দাঁড়ায় যে, রাজাকে রেখে দেওয়ার নরমপন্থা প্রয়োগ করে তাঁকে অকার্যকারী করে দেওয়া হয়েছিল। ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে সংসদ যে আইন পাশ করেছিল তার ফলশ্রুতিতে রাজা কিংবা রানী সংসদের দ্বারা নির্বাচন আইনসম্মত হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার আইনের মতো আইন ব্রিটিশ সংসদে পাশ হয়েছিল অনেক আগেই (১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে)। শাসকশ্রেণীর এই জনমুখী নীতির পাশাপাশি উৎপাদন ক্ষেত্রে আসে জোয়ার। উৎপাদিকা শক্তির বৈপ্লবিক বিকাশ ঘটেছিল ইংলন্ডে। অর্থাৎ পুঁজিবাদ ভূমিষ্ট হয়ে গেছে। ইতিহাসে এই পর্যায়কে ইংলন্ডে শিল্প বিপ্লবের যুগ বলা হয়। সমস্ত সমাজ তখন পূরানো উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে বিরোধী অবস্থানে চলে যাচ্ছে। তাই নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার (পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার) জয় ঘোষণা করেছিল বুদ্ধিজীবী মহল।

সংসদে নাগরিক অধিকারের বিল পাশ হয়ে আইন হয়েছিল যখন, সেই বছরই নিউটন সংসদের সদস্য হয়েছিলেন। এর আগেই তিনি রয়াল সোসাইটি থেকে বেড়িয়ে এসে নানা সামাজিক কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলন্ডের টাকশালের প্রধান পদে যোগ দেন নিউটন। তিনি এখানে মুদ্রা তৈরীর প্রাচীন পদ্ধতির সংস্কারসাধন করেছিলেন।

যে রবার্ট হুকের সাথে নিউটনের সংঘাত হয়েছিল, সেই হুক কিন্তু বিজ্ঞানের জগতে অনেক অবদান রেখে গেছেন। বাস্তুবিদ্যা বা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ হুকের সূত্র (Hook's law) আমরা আজও ব্যবহার করি। বাস্তুবিদ্যা পদার্থের স্থিতিস্থাপকতা এবং অস্থিতিস্থাপকতা বা এদের মিশেল ধর্মকে ব্যবহার করেই দাঁড়িয়ে আছে। তখনকার দিনে মনে করা হোত জীবাশ্ম বা ফসিল হল প্রকৃতির বিচিত্র সৃষ্টি। তিনি দেখালেন এগুলি জীবদেহের কালের প্রবাহে বিলুপ্ত হওয়ার পর প্রস্তরিভূত রূপ। এই বিভিন্ন বিষয় হুকের মূল্যবান মতামত ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীদের অনেক কাজে এসেছে। যদিও তাঁর ব্যক্তিগত স্বীকৃতির প্রবল চাহিদা এই বিরাট মাপের বিজ্ঞানীকে খাটো করে দিয়েছে। ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট হুকের মৃত্যুর পর নিউটন আবার রয়াল সোসাইটিতে যোগদান করেছিলেন এবং আমৃত্যু তার সভাপতি

থেকেছেন। ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে রানী তাঁকে নাইট উপাধি দিয়েছিলেন [নাইট (Knight) এর অর্থ যোদ্ধা] এই প্রথম নিউটনের নামের পাশে স্যার উপাধি যুক্ত হল। ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ নিউটনের মৃত্যু হয়েছিল। পুঁজিবাদী সমাজের সূচনালগ্নে নিউটনের শেষ জীবন অতিবাহিত হয়। মানুষের সমাজের এই বিকাশমান পর্যায়ে নিউটন তাঁর যথার্থ অবদান রেখে গেছিলেন।

আমরা অ্যারিস্টটল-টলেমী-কোপার্নিকাস হয়ে কেপলার-গ্যালিলিও পর্যন্ত দার্শনিকদের স্ববিরোধের কথা আগে উল্লেখ করে গেছি। প্রত্যেকে তাঁদের যুগের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পারেন নি, আবার অজান্তে তা অতিক্রমের কথাও বলেছেন। নিউটনের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটল না। এ বিষয় স্টিফেন হকিংস-এর রচনা থেকে অংশ বিশেষ তুলে ধরছি –

....'নিউটন বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর মহাকর্ষীয় তত্ত্ব অনুসারে তারকাগুলির পরস্পরকে আকর্ষণ করা উচিত। সুতরাং মনে হয়েছিল তারা মূলত গতিহীন থাকতে পারে না। কোনো একটি বিন্দুতে কি তাদের একসঙ্গে পতন হবে না? সে যুগের আর একজন চিন্তানায়ক রিচার্ড বেস্টলীকে ১৬৯১ খ্রীষ্টাব্দে একটি পত্রে নিউটন যুক্তি দেখিয়েছিলেন, এরকম হতে পারত শুধুমাত্র যদি তারকাগুলির সংখ্যা সীমিত হোত এবং তারা যদি স্থানের একটি সীমিত অঞ্চলে বিতরিত থাকত। কিন্তু তাঁর যুক্তি ছিল ঃ অন্য দিক থেকে বলা যায় – যদি তারকার সংখ্যা অসীম হয়, তারা যদি সীমাহীন স্থানে কমবেশি সমরূপে বিতরিত থাকে, তাহলে এ রকম হবে না। কারণ পতিত হওয়ার মতো কোনো বিন্দু থাকবে না।' [কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস – স্টিফেন হকিংস, পৃষ্ঠা-২৫ বাংলা সংস্করণ]

আপাতভাবে নিউটনের কথাগুলি যুক্তিযুক্ত মনে হলেও, যে ধারণার উপর দাঁড়িয়ে তিনি এই ব্যাখ্যা রাখলেন, সেখানে মহাবিশ্ব যদি অসীম পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং তাতে বস্তুর সংখ্যা অসীম হয়,তবেই তা সম্ভব হবে। কিন্তু মহাবিশ্ব ও সেখানে উপস্থিত বস্তুর পরিমাণ সীমাহীন, এটা তিনি কীভাবে জানলেন? এও তো একরকম স্থির চিন্তার প্রতিফলন। অ্যারিস্টটল-টলেমীর মতো এটাও তো একটা মন্তব্য। যুক্তির বিচারে কেউ হয়তো বলতে পারেন যে, এটাকে বিপরীতক্রমে সত্যরূপে দেখাতে চেয়েছেন নিউটন। এই রকম যুক্তির জবাবে স্টিফেন হকিংস ঐ পুস্তকের ঠিক পরের অনুচ্ছেদে লিখছেন –

'অসীমত্ব নিয়ে বলতে গেলে কি রকম ভুল হতে পারে এই যুক্তি তার একটা দৃষ্টান্ত। একটি অসীম মহাবিশ্বের প্রতিটি বিন্দুকেই একটি কেন্দ্র বলা যেতে পারে, তার কারণ প্রতিটি বিন্দুরই সর্বদিকে অসীম সংখ্যক তারকা থাকবে। অনেক পরে বোঝা গিয়েছিল নির্ভুল দৃষ্টিভঙ্গি হবে শুধু সীমিত পরিস্থিতির বিচার করা। সেই পরিস্থিতিতে তারকাগুলি পরস্পরের উপর পতিত হবে। তারপর প্রশ্ন করা উচিত এই অঞ্চলের বাইরে যদি মোটামুটি সমরূপে বিতরিত আরো অনেক তারকাকে যোগ করা যায়, তা হলে কি পরিবর্তন হতে পারে। নিউটনের বিধি অনুসারে বাড়তি তারকাগুলি মূল তারকাগুলির ব্যাপারে গড়ে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করবে না। সুতরাং তারকাগুলি একই দ্রুতিতে পতিত হবে। আমরা যতখুশী তারকা যোগ করতে পারি। তবুও তারা সর্বদা নিজেদের উপরে (but they will alwways collapse in on themselves) পতিত হয়ে চুপসে যাবে। এখন আমরা জানি মহাবিশ্বের এমন একটি স্থির প্রতিরূপ অসম্ভব যে প্রতিরূপে মহাকর্ষ সব সময়ই আকর্ষণ করে'।

নিউটনের এই অসীম স্থির মহাবিশ্বের ধারণা অজান্তেই মানুষের মহাবিশ্বের অন্বেষণের কার্যক্রম থামানোর কথা বলে। কিন্তু এর বিপরীতে তৎকালীন দার্শনিকদের এ বিষয় মনে প্রশ্ন এসেছিল। এযুগের বিজ্ঞানী হকিংস এই তত্ত্বের বিরোধিতা করেছেন নতুন যুক্তি দিয়ে। আমরা বলি যে, নিউটন তাঁর যুগের সীমারেখায় দাঁড়িয়ে এই মন্তব্য করেছিলেন। নিউটনের ক্লাসিকাল পদার্থবিদ্যার গতিবিদ্যা, আলোর বস্তুকণা ধর্ম, তাঁর মহাকর্ষ সূত্রের ব্যাখ্যা, বস্তুর ভর সম্পর্কে নিউটনের ধারণা, ভরবেগ সম্পর্কে – এমনকি বস্তুর সম্পর্কে ধারণা, শক্তির ধারণার আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। পরিবর্তনটাই বিজ্ঞানসম্মত। **কারণ বিজ্ঞান সর্বদা এক অসমাপ্ত আর অবিরত অন্বেষণের জ্ঞান।**

নিউটনকে যদি তাঁর সময়ের সাপেক্ষে বিচার না করি, তার থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দিই, তবে তার থেকে বড় ভুল আর হবে না। একথা সকল মনীষীর জন্যই প্রযোজ্য। নিউটন সেই সময় দাঁড়িয়ে গণিতের প্রয়োজনীয় বিকাশ ঘটিয়ে এমন কতগুলি সংরক্ষণ সূত্র দিয়েছিলেন, যার প্রয়োগ করে আমরা সে যুগে বস্তুর বিকাশের নিয়ম জানতে গিয়ে তখনকার বৌদ্ধিক বিচার অনুসারে প্রায় প্রশ্নাতীতভাবে নিশ্চিত হয়েছি; এতোটাই প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল তার আবিষ্কারগুলি। তাঁর সময়কালে এবং পরবর্তী বহুকাল পর্যন্ত বহু প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন হয়েছে; উৎপাদনের চাকা ঘুরে গেছে তীব্র গতিতে। তার সাথে সাথে মানব সভ্যতার যে বিকাশ হয়েছে, তা মহাবিশ্বের অন্বেষণে থাকা মানুষের মস্তিষ্কের আরো গুণগত বিকাশ ঘটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এই অন্বেষকরা প্রত্যেকেই নিউটনের অবদান অস্বীকারতো নয়ই – পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন। (ক্রমশ)

স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব ঃ

অক্ষয় কুমার দত্ত

বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা ও যুক্তিবাদের পুরোধা

Telescope - দূরবীন, Microscope - অনুবীক্ষণ, Magnet - চুম্বক, Mensuration - পরিমিতি, Electricity - তড়িৎ। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ব্যবহৃত ইংরেজী পরিভাষার জনপ্রিয় বাংলার কয়েকটা উদাহরণ। এছাড়াও আরো আছে। জ্যোতির্বিদ্যা, বজ্র, বাষ্প, জোয়ার, রামধনু, অঙ্গার, ধ্রুবতারা, দাহ্য পদার্থ, জড়, মাধ্যাকর্ষণ, সৌরজগৎ, গ্রহণ, জ্বালামুখী, আগ্নেয়গিরি, সুমেরু, কুমেরু ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব পরিভাষা এতই নির্দিষ্ট অর্থবোধক আর সহজ যে মনে হবে উৎসটাই বাংলা। এগুলো এবং আরো অনেক পরিভাষার জনক একজনই – **অক্ষয়কুমার দত্ত, ১৫ই জুলাই ২০১৯ ওনার জন্মের দ্বিশতবর্ষের সূচনা হল।**

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই বর্ধমান জেলার নবদ্বীপ সংলগ্ন চুপী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ছিলেন পুলিশ বিভাগের কোষাধ্যক্ষ। তখনকার ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে পড়াশুনা শুরু করেন কলকাতায়।

মেধাবী, কিন্তু অষ্টম শ্রেণির বেশি পড়া হয়নি। বাবার অকাল মৃত্যুতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় ইতি টানতে হয়। তিনি ছিলেন একপ্রকার স্বশিক্ষিত। সংস্কৃত, ফারসী, ইংরাজী, জার্মান, পদার্থবিদ্যা, গণিত, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূগোল – বিস্তৃত বিষয় সমূহ অধ্যয়ন করেন। অর্থের প্রয়োজনে সাংবাদিকতা শুরু করেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর কাগজে (১৮৩৮ খ্রীঃ)। ইতিপূর্বেই পারিবারিক প্রথা মেনে ১৮৩৫ এ তাঁর বিবাহ হয়।

ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে। ১৮৩৯ এ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হন এবং পরের বছর ঐ পাঠশালার পদার্থবিদ্যা ও ভূগোলের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ছাত্রদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের প্রথম বই রচনা ও প্রকাশ করেন – ভূগোল (১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে)। ১৮৪২ এ বিদ্যাদর্শন নামে মাসিক পত্র প্রকাশ করতে শুরু করেন। কিন্তু ৬ মাসের বেশী চালাতে পারেননি। দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে অক্ষয়কুমারকে নিযুক্ত করেন প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ফলাফলের ভিত্তিতে। আদি ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য হিসেবে তিনি প্রাথমিকভাবে ছিলেন নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক। কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞান থেকে জ্ঞান আহরণের দরজা বন্ধ করেননি। তিনি সম্পাদক থাকাকালীন (১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) তত্ত্ববোধিনী কাগজে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, ভূগোল, বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার সাথে সাথে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলন, বিধবা বিবাহ সমর্থনমূলক, বাল্যবিবাহ বিরোধী তথা অসবর্ণ বিবাহ সমর্থন করে লেখা প্রকাশিত হয়েছে। সে যুগে তত্ত্ববোধিনী কাগজ এর বিক্রী ৭০০ কপি ছাপিয়ে গিয়েছিল। রমেশ চন্দ্র দত্ত লিখেছেন "বঙ্গদেশে সর্বত্র লোকে ঐ কাগজের প্রতিটি সংখ্যার জন্য ব্যাকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিত। সেই চুপচাপ রোগজীর্ণ কিন্তু অক্লান্ত কর্মী মানুষটি তাঁহার ডেস্কের সামনে বসিয়া বেশ কয়েকটি বছর ধরিয়া বাঙালীদের মতামতকে, তাহাদের চিন্তাগত অবস্থানকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করিয়াছিলেন।" সেকারণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ ও নারী শিক্ষা বিষয়ক এবং বহুবিবাহবিরোধী রচনা তত্ত্ববোধিনী কাগজে প্রথম প্রকাশ করেন। অক্ষয়কুমার সম্পাদকীয় নিবন্ধে এই সব রচনাকে সমর্থন যুগিয়েছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনীকে মূলতঃ বেদ-উপনিষদের চর্চা এবং ব্রাহ্মধর্মের প্রচারের হাতিয়াররূপে বিকশিত করতে চেয়েছিলেন। এটি ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্রও ছিল। অক্ষয়কুমার এই পত্রিকাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমাজ সংস্কার মূলক উৎকৃষ্ট রচনা প্রকাশের মাধ্যমরূপে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে চলেছিলেন। কিন্তু তত্ত্ববোধিনীর জনপ্রিয়তা – উৎকৃষ্ট মান পত্রিকার মালিকরা অস্বীকার করতে পারেননি।

অক্ষয়কুমার ব্রহ্ম উপাসক থেকে যাত্রা শুরু করেন। অধ্যয়ন, তার প্রয়োগ এবং বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে আত্মা-পরমাত্মা-বিশ্বব্রহ্মান্ডের নিয়ন্ত্রক রূপে ঈশ্বরের ভূমিকায় তিনি সন্দিহান হয়ে পড়েন। স্বভাবতই ব্রাহ্ম ধারণার থেকে দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে। বেদকে ঈশ্বরের সৃষ্টি রূপে মানতে অস্বীকার করেন। বেদ অভ্রান্ত এই ধারণা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। তত্ত্ববোধিনী সভায় বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞানান্বেষাকে ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের উপর স্থান দিয়ে বক্তব্য পেশ করেন, তিনি বলেন **পৃথিবীই হল ধর্মশাস্ত্র – বিশুদ্ধ যুক্তিবাদ আমাদের শিক্ষক।** ("The whole world is

our scripture and pure rationalism is our teacaher".)

স্বভাবতই অক্ষয়কুমার ব্রাহ্ম সমাজের কর্তাদের কাছে ব্রাত্য হয়ে ওঠেন। তিনি তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদনার দায়িত্ব থেকে সরে আসেন ১৮৫৫ সালে। এর পরও দীর্ঘ সময় ধরে তত্ত্ববোধিনী প্রকাশিত হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তার সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন। কিন্তু পত্রিকার সেই উৎকর্ষ ও জনপ্রিয়তা কোনটাই ধারাবাহিকভাবে বজায় রাখা যায়নি।

অক্ষয়কুমার তাঁর অনুসন্ধানী প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে অজ্ঞেয়বাদী থেকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদে ক্রম পরিবর্তিত হয়েছেন। হিন্দু জীবনাচার এবং পূজা-পাঠ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অনীহা থেকে ক্রমশঃ অবিশ্বাসীতে পরিণত হয়েছেন। আগে তাঁর মত ছিল পূজো-পাঠ-প্রার্থনা সংস্কৃতের বদলে বাংলায় করা উচিত। পরে ঈশ্বরের উপাসনা বা প্রার্থনাকেই অস্বীকার করেন, যা বীজগণিতের সূত্রের মত করে প্রকাশ করেন। নবীন প্রজন্ম তাতে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন।

পরিশ্রম = শস্য। পরিশ্রম + প্রার্থনা = শস্য

অতএব প্রার্থনা = শূন্য

সেই সময়ে বহুচর্চিত 'রেনেসাঁর' (!) বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাজগতে এই প্রকার যুক্তিবাদ বিরল।

সে যুগের বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা ছিল সেই মানদন্ডেও অক্ষয়কুমার ছিলেন অগ্রগণ্য। ১৮৫২ সালে প্রকাশিত 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার (১ম ভাগ) [১৮৫৩ য় ২য় ভাগ প্রকাশিত হয়]। এখানে তিনি অল্প বয়সে বিবাহের বিরুদ্ধে, পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক সম্বন্ধ, বিবাহর সীমাবদ্ধতা, বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার প্রসঙ্গে মত ব্যক্ত করেছেন। যা বিধবা বিবাহ-বহুবিবাহ বিরোধিতার ধারণা থেকেও এককদম এগিয়েছিল।

জনপ্রিয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর চারুপাঠ (১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ) স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরও প্রশংসা অর্জন করেছিল। এখানে তিনি ছোট ছোট জনপ্রিয় সহজবোধ্য প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন সাধারণ বিষয় চর্চা করেছিলেন যা সাধারণের মনে ছাপ ফেলতে সক্ষম ছিল।

বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক অক্ষয়কুমার তুলনামূলকভাবে কম প্রচারিত। কিন্তু বাংলা গদ্যে তাঁর অবদান কারও থেকেই কম নয়। বাংলা ভাষায় যতিচিহ্নের প্রবর্তন করেন তিনি। ১৮৫৬ সালে লিখেছেন 'পদার্থবিদ্যা'। রেলব্যবস্থার উপর প্রথম বাংলা লেখা বইও অক্ষয়কুমারের (বাষ্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ - ১৮৫৫)। বাংলা কবিতায় 'ছন্দের জাদুকর' সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর পিতামহ ছিলেন অক্ষয়কুমার। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর প্রতি উৎসর্গ পত্রে লিখেছিলেন 'বঙ্গীয় গদ্যের গৌরবস্থল – আমার পূজ্যপাদ পিতামহ'। মাতৃভাষায় শিক্ষা বিশেষতঃ বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এর প্রসারের জন্য তিনি তাঁর সম্পত্তির অর্ধেক দান করেছিলেন।

বিজ্ঞানের প্রসারে এবং অন্ধবিশ্বাস-কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অক্ষয়কুমার দত্তর সংগ্রাম, সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে কেন, আজকের নিরিখেও তুলনাহীন। তিনি যা বিশ্বাস করতেন তাই জীবনযাপনে প্রয়োগ করতেন। তঞ্চকতা ছিল না। যন্ত্রবিজ্ঞান দেখে জ্ঞান অর্জন করার জন্য ফ্যাক্টরীতে যেতেন। সমুদ্রভ্রমণে বার হয়েছেন পৃথিবীর আকৃতি অনুভব করার জন্য। **ইচ্ছে করে বারবেলা, কালবেলা, কালরাত্রি, অশ্লেষা, মঘা, এ্যহস্পর্শ ইত্যাদি পঞ্জিকা মতে অশুভ সময়ে বার হতেন। 'ফলিত' উপায়ে ফলাফল বোঝার জন্য!**

ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন করতে সচেষ্ট হন অক্ষয় কুমার। ১৮৫ টা ধর্মসম্প্রদায়কে নিয়ে ক্ষেত্র সমীক্ষার ভিত্তিতে দুখন্ডে প্রকাশ করেন "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়"। এছাড়া প্রকাশ করেন ধর্ম্মনীতি (১৮৫৫)। ধর্ম বিষয়ে তাঁর মতামত সেযুগে শুধু নয় এ যুগের 'মস্তিষ্কের অন্ধকার'কে তীব্রভাবে আঘাত করবে।

বহু প্রচারিত 'বাংলার নবজাগরণের' (!) মনীষীদের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত বিস্মৃত প্রায়। অথচ তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মনীষীরা তাঁর কদর বুঝতেন। সে যুগে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনীর এই দক্ষ সম্পাদকের বেতন ক্রমশঃ বাড়িয়ে ৬০ টাকা করেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্কুল সমূহের সহকারী পরিদর্শকের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানান। বেতন ছিল দেড়শ টাকা। ব্যস্ত সম্পাদক অক্ষয়কুমার সে প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেননি। সম্পাদনার দায়িত্ব ত্যাগ করার পর শিক্ষাবিভাগের নির্দেশক ইয়াং এর অনুরোধে নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অসুস্থতার কারণে চাকরী ছাড়তে বাধ্য হন। তাঁর অসুস্থ্যতার খবরে দেশে ফিরে যাবার পর ম্যাক্স মুলার চিঠি দিয়ে তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।

তিনি কলকাতা থেকে দূরে বালিতে শেষ জীবন কাটান, অবসরে নয় অসুস্থতা সত্ত্বেও কর্মতৎপরতায়। বাড়ির নাম – 'শোভনোদ্যান' (বোটানিক গার্ডেন)। সেখানে তৈরী করেছিলেন উদ্ভিদ চর্চা কেন্দ্র। ছিল ৩৮ রকমের বৃক্ষ, ১৫ প্রকার ফুল, ১৬ ধরনের মসলা। তৈরী করেছিলেন ভূতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা, প্রচুর নমুনা সংগৃহীত ছিল। খনিজ, প্রস্তর, ফসিল ইত্যাদি।

সার্বিক বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন এটাই দেখায় যে কোন মানুষ তাঁর সমসময় দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকেন। জ্ঞান ও তার প্রয়োগ

সীমানাকে প্রসারিত করে। অক্ষয়কুমার দত্তও সমকালীন ভারতবর্ষ এবং তখনকার অর্থনীতি-রাজনীতি দ্বারা সীমায়িত ছিলেন। 'নবজাগরণের' অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের মত তাঁর মধ্যেও এই ধারণা ছিল যে, উন্নত ব্রিটিশ রাজ দ্বারা পশ্চাদপদ ভারতীয় সমাজের উন্নতি বিধান হবে। তিনি শাসক ব্রিটিশ কর্তাব্যক্তিদের অত্যাচারের বিরোধিতা করেছেন, নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেছেন। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে মহান মনে করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ১৯০১ সালে অক্ষয়কুমারের কিছু রচনা সংকলিত করে প্রকাশ করেন। 'প্রাচীন হিন্দুগণের সমুদ্রযাত্রা' শীর্ষক এই বইতে একজায়গায় অক্ষয়কুমার লিখছেন "ভারত ত বহুদিন হইতেই পরহস্তগত হইয়েছে, কিন্তু নরপিশাচ নাদের শাহ ও উচ্ছৃঙ্খল আরঙ্গজেবের ন্যায় শাসকগণ ও সর্ব্বগ্রাসী বণিকদিগের হস্ত হইতে যে নিস্কৃতি পাইয়া মহারানীর হস্তে আসিয়েছে, ইহা ভারতবাসীর অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নয়।" ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামকে তিনিও 'বিপদ' হিসেবে গণ্য করেছিলেন। এই সীমাবদ্ধতা তাঁর একার ছিল না। তৎকালীন 'শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত' তথাকথিত নবজাগরণের ফলে সৃষ্ট বুদ্ধিজীবীদের সাধারণ সীমাবদ্ধতা।

অক্ষয় কুমার দত্ত দর্শনের ক্ষেত্রে দীর্ঘ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বস্তুবাদকে গ্রহণ করেছিলেন। সেজন্যই বলেছিলেন **"বেদ ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট নয়। বিশ্ববেদান্তই প্রকৃত বেদান্ত। অখিল সংসারই আমাদের ধর্মশাস্ত্র। বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদের আচার্য্য।"** স্বভাবতই পরলোক আর পুনরায় প্রত্যাবর্তনে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু মানব সমাজের বিকাশে মনীষীদের খন্ড খন্ড অবদানগুলি থেকে যায়; আগামীর ভিত্তি ভূমি হিসেবে কাজ করে যায়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মে অক্ষয় কুমার দত্তর মৃত্যু হয়েছে কিন্তু আজকের ছাত্র সমাজ যখন 'পরিমিতি' অনুশীলন করে, 'পুরাতত্ত্বের' নিদর্শন খুঁজে চলে অথবা 'অনুবীক্ষণ' যন্ত্র ব্যবহার করে তখন তিনি বেঁচে থাকেন ভিন্ন ভাবে।■

●২৬ *পৃষ্ঠার পর* *অপবিজ্ঞান*

তখন অন্য বিজ্ঞান রচনা করিব। বিজ্ঞানী যে সূত্র প্রণয়ন করেন তাহা কখনও কখনও সংশোধন করিতে হয় সত্য, কিন্তু তাহা প্রাকৃতিক বিধির পরিবর্তনের ফলে নয়।

অতএব, অদৃষ্টের অর্থ – অনির্ণেয় ও অসাধ্য ঘটনাসমূহ: নিয়তির অর্থ – সমস্ত ঘটনার অখন্ডনীয় সম্বন্ধ বা আনুপূর্ব। ঘটনার কারণ অদৃষ্ট বা নিয়তি নয়। কিন্তু সাধারণ লোকে অদৃষ্টকে অনর্থক টানিয়া আনিয়া সুখদুঃখের ব্যাখ্যা করে। জীবনযাত্রা যখন নিরুদ্‌বেগে চলিয়া যায় তখন কারণ জানিবার ঔৎসুক্য থাকে না। কিন্তু যদি একটা বিপদ ঘটে, কিংবা যদি কোন পরিচিত হঠাৎ পরলোকগত হয়, তখনই মনে কষ্টকর প্রশ্ন আসে – কেন এমন হইল? বিজ্ঞলোক ব্যাখ্যা করেন – বাপু, কেন হইল সেটা বুঝিলে না! উত্তরে যদি বলা হয় – কলেরা, সর্পাঘাত, অনেক বয়স – তবে একটা কারণ বুঝা যায়। কিন্তু ইহা বলা বৃথা – মরণের অনির্ণেয়তা, বা অনিবার্যতাই মরিবার কারণ। অথচ, 'অদৃষ্ট' বলিলে ইহাই বলা হয়। যাহা অবিসংবাদিত সত্য বা truism তাহা শুনিলে কাহারও কৌতুহলনিবৃত্তি বা সান্ত্বনালাভ হয় না, সুতরাং ইহাও বলা বৃথা – অমুক লোকটি ঘটনাপরম্পরার ফলে মরিয়াছে। অথচ, 'নিয়তি' বলিলে ইহাই বলা হয়। 'অদৃষ্ট' ও 'নিয়তি' শব্দ সাধারণের নিকট প্রকৃত অর্থ হারাইয়াছে এবং বিধাতার আসন পাইয়া সুখদুঃখের নিগুঢ় কারণ রূপে গণ্য হইতেছে।

অধ্যাপক Poyinting-এর উক্তিটি উদ্ধারযোগ্য।

No long time ago physical laws were quite commonly described as the Fixed Laws of Natuer, and were supposed sufficient in themselves to govern the universe ... A law of nature explains nothing – it has no governing power, it is but a descriptive formula which the careless has sometimes personified.■

বিজ্ঞপ্তি

গত 'অষ্টম বর্ষ, সংখ্যা-২, জুন ২০১৯' এ প্রচুর বানান ভুল ও বাক্যগঠনগত ত্রুটি থেকে গেছে। বিশেষ করে 'ভূতের লাভ' গল্পে কয়েকটি চরিত্রে নামকরণে ভুল হওয়ায় পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয়েছে। গত 'নবম বর্ষ, সংখ্যা ১, জুন ২০১৯'-এ ধারাবাহিক নিবন্ধ 'মহাবিশ্বের অন্বেষণে মানুষ'-এর নবম অনুচ্ছেদে ভ্রান্তির কারণে নিম্নোক্ত লাইনটি বাদ যাবে –

'দ্বিতীয় সূত্রে পাব অজড় সাপেক্ষ কাঠামো বা নন ইনারশিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্সে (অর্থাৎ যখন বস্তুর বেগের পরিবর্তন হচ্ছে) কী ঘটে।'

বিজ্ঞানের খবর

এপ্রিল ২০১৯

১. * নাসার কিউরিওসিটি রোভার মঙ্গলের গেল ক্রেটারের ৩০০ মাইল পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি বরফের চাদর থেকে নির্গত মিথেন গ্যাসের সন্ধান পেয়েছে। কিউরিওসিটি রোভার "গেল ক্রেটারের" আরও অনুসন্ধান চালাচ্চে। তথ্যসূত্র - নাসা

* সুইজারল্যান্ডের জুরিখে অবস্থিত "ইটিএইচ জুরিখ" নামক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গণিতের একটি ইউনিভারসিটির বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণ কম্পিউটারের মাধ্যমে কউলোব্যাকটার এথেনসিস-২.০ নামে একটি ব্যাকটেরিয়াল জিনোমের আবিষ্কার করেছেন, যদিও এই জিনোম থেকে কোন ব্যাকটেরিয়ার সৃষ্টি হয়নি। তথ্যসূত্র – ইউরেকা অ্যালার্ট

৪. * কিউরিওসিটি রোভার থেকে প্রাপ্ত মঙ্গলের দুই উপগ্রহ ফোবোস ও ডিমোস দ্বারা মঙ্গলের আকাশে ঘটে যাওয়া সূর্যগ্রহণের ছবি নাসার পক্ষ থেকে করা হয়েছে। তথ্যসূত্রঃ নাসা

১০. * "ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপ" প্রোজেক্টের বিজ্ঞানীরা ৫৪ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এম৮৭ গ্যালাক্সি তে এই প্রথম ব্ল্যাক হোলের ছবি পেয়েছেন। তথ্যসূত্র – ইউরেকা অ্যালার্ট

১১. * নাসার কিউরিওসিটি রোভার মঙ্গলে অবস্থিত এওইলিস মন্স নামক এক পর্বতের পৃষ্ঠতল থেকে খুঁড়ে গভীরে পৌঁছে ওই জায়গার মাটি ও মাটিতে থাকা বিভিন্ন খনিজকে বেশ ভালভাবে পরীক্ষা করেছে যা কিউরিওসিটি রোভারের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তথ্যসূত্র – নাসা

১২. * নাসার পক্ষ থেকে "অ্যাস্ট্রোনট টুইন স্টাডি" বা যমজ মহাকাশচারীর পরীক্ষা অর্থাৎ যমজ দুই মহাকাশচারীর একজন পৃথিবীতে ও একজন ইন্টারন্যাশানাল স্পেস স্টেশনে এক বছর কাটানোর পর দেখা গেছে যে – এই দুই যমজ মহাকাশচারীর ডিএনএ-র গঠন ও চেতনাগতভাবে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হয়েছে যা এক বছর আগেও ছিল না। তথ্যসূত্র – দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস

১৬. * আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া ইউনিভার্সিটি অফ পেন্সিলভ্যানিয়ার বিজ্ঞানীরা এই প্রথম CRISPR প্রযুক্তির দ্বারা জিন এডিট করে এমন কিছু ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা করছেন, চিরাচরিত চিকিৎসা পদ্ধতি দ্বারা যাদের চিকিৎসায় সাফল্য আসেনি। তথ্যসূত্র – এনগ্যাজেড

১৭. * নাসার জ্যোতির্বিদরা অনেক গবেষণার পর পৃথিবী থেকে ৩০০০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এনজিসি ৭০২৭ নামক এক প্ল্যানেটারি নেবুলাতে হিলিয়াম হাইড্রাইডের খোঁজ পেয়েছেন, এই হিলিয়াম হাইড্রাইড বিগ ব্যাং এর ১,০০,০০০ বছর পরে তৈরি হয়েছিলো। তথ্যসূত্র – দ্য নেচার

২৩. * নাসার ইনসাইট ল্যান্ডার মঙ্গল গ্রহে এই প্রথম ভূমিকম্পের মত কম্পনের খোঁজ পেয়েছেন। তথ্যসূত্র – নাসা

২৯. * হাবল স্পেস টেলিস্কোপের সাথে যুক্ত বিজ্ঞানীরা দুটি গ্রহাণুপুঞ্জের মধ্যবর্তী অংশে ব্ল্যাকমাইনস্টার ফুলারিন বা বাকিবলস বা C_{60}-র খোঁজ পেয়েছেন। তথ্যসূত্র – দ্য অ্যাস্ট্রোফিজিকাল জার্নাল লেটারস

৩০. * জাপানের টোকিও ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্সের জীববিজ্ঞানীরা সরল প্রোক্যারিওটিক কোষ থেকে জটিল ইউরিক্যারিওটিক কোষের পরিবর্তনে বড় আকারের মেডুসা ভাইরাসের বেশ ভালো ভূমিকা আছে। তথ্যসূত্র – ইউরেকা অ্যালার্ট

মে ২০১৯

১. * আমেরিকার নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ মেডিসিন আর ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানের বিজ্ঞানীরা ইঁদুরের শরীর থেকে ATDC জিন সরানোর মাধ্যমে ইঁদুরটির প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সারের সফলভাবে নিরাময় করতে সক্ষম হয়েছেন। তথ্যসূত্র – ইউরেকা অ্যালার্ট

৩. * ইউনাইটেড কিংডম-এর ন্যাশনাল নিউক্লিয়ার ল্যাবরেটরি আর ইউনিভার্সিটি অফ লিসেস্টার এর গবেষকরা আমেরিসিয়াম নামক এক রাসায়নিক পদার্থ থেকে এমন এক ধরনের স্পেস ব্যাটারি আবিষ্কার করেছেন যা থেকে ভবিষ্যতের মহাকাশ অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের যোগান পাওয়া যাবে। তথ্যসূত্র – ওয়ার্ল্ড নিউক্লিয়ার নিউজ

৬. * কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির গবেষকরা "টেম্পারেচার সুইং সলভেন্ট এক্সট্রাকশান" নামক এমন এক ডিস্যালাইনেশান পদ্ধতির আবিষ্কার করেছেন যা হাইপারসেলাইন ব্রাইন মানে যে জলে সমুদ্রের জলের থেকেও বেশি লবণ থাকে এমন জলকে লবণ মুক্ত করতে পারে। এই ডিস্যালাইনেশান পদ্ধতির খরচও অনেক কম আর অনেক বেশি ফলপ্রসু। তথ্যসূত্র – কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি

৮. * ব্রিটেনের ১৭ বছর বয়সী কিশোরী ইসাবেল হোল্ডওয়ের শরীরে জেনেটিকালি মডিফায়েড "ফেজ থেরাপির" মাধ্যমে তার ড্রাগ-রেসিস্টেন্স সংক্রমণ এর সফল চিকিৎসা করা হয়েছে। তথ্যসূত্র – দ্য গার্ডিয়ান

১৪. * অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে অবস্থিত ম্যাককুয়ারি ইউনিভার্সিটির গবেষকরা জানিয়েছেন যে প্লাস্টিক দূষণের ফলে

সমুদ্রে থাকা প্রোকোলোকক্কাস নামক ফটোসিন্থেটিক ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি, সালোকসংশ্লেষ আর অক্সিজেন উৎপাদন ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তথ্যসূত্র – ইউরেকা অ্যালার্ট

১৫. * ব্রিটেনের মেডিকাল রিসার্চ কাউন্সিল ল্যাবরেটরি অফ মলিকিউলার বায়লজির গবেষকরা ব্যাকটেরিয়া এসেকেরিয়া কোলাই বা ই-কোলাই এর ডিএনএ-তে পরিবর্তন ঘটিয়ে এক নতুন জীবের সৃষ্টি করেছেন। মানুষের দ্বারা সৃষ্ট এই জীবের ডিএনএ আগে সৃষ্ট করা যে কোনও ডিএনএ-র থেকে 8 গুণ বেশি জটিল। তথ্যসূত্র – দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস

২০. * পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত এসআই পদ্ধতির পুনরায় যে নতুন সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা বেশিরভাগ দেশই চালু করে দিয়েছে। তথ্যসূত্র – ব্যুরো অফ ইন্টারন্যাশনাল দেস পইডস এত মেজারস (বিআইপিএম)

২১. * কানাডার ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটির গবেষকরা ভ্যাক্সিন সংরক্ষণকারী এমন এক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন যার দ্বারা ভ্যাক্সিনকে 40 ^{0}C তাপমাত্রাতেও এক সপ্তাহ পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। তথ্যসূত্র – ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটি

২২. * আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগোর গবেষকরা -23 ^{0}C (-9 ^{0}F) তাপমাত্রাতে সুপারকন্ডাক্টিভিটির আবিষ্কার করেছেন। তথ্যসূত্র – ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো

২২. * কানাডার উত্তরে অবস্থিত কানাডিয়ান আর্কটিকে অউরাস্ফিরিয়া গিরালডে নামক ছত্রাকের এমন এক ফসিল পাওয়া গেছে যা পৃথিবীতে এসেছিল দশ কোটি বছর আগে। তথ্যসূত্র – দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস

২৩. * আমেরিকার অস্টিন-এর ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস-এর গবেষকরা মঙ্গল গ্রহের উত্তর মেরুর দিকে ব্যাপক পরিমাণ জলের সন্ধান পেয়েছেন। তথ্যসূত্র – গিজমোডো

২৮. * আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ মিনেসোটা এবং ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটস এর গবেষকরা রাসয়ানিক বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত অনুঘটকের ক্ষমতা দশ হাজার গুণ বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। এর ফলে আগামী দিনে রাসয়ানিক বিক্রিয়াগুলিকে আরও দ্রুত করা সম্ভব হবে। তথ্যসূত্র – ইউনিভার্সিটি অফ মিনেসোটা

জুন ২০১৯

৩. * চিনে জিন এডিটিং-এর দ্বারা জারমলাইন এডিটিং করার মাধ্যমে জন্ম নেওয়া জমজ শিশু কন্যাদের এমন মিউটেশান হয়ে গেছে যে তাদের আয়ুস্কাল কমে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তথ্যসূত্র – বিবিসি নিউজ

৬. * ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রনমিকাল ইউনিয়ন (আই এ ইউ) তাদের ১০০ বছর পালন উদ্‌যাপন করছে। এই উপলক্ষে তারা বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন জ্যোতিষ্কর নামকরণের জন্য আহ্বান জানিয়েছে। পরবর্তীকালে এই নামগুলি দ্বারাই ওই জ্যোতিষ্ক চিহ্নিত হবে। তথ্যসূত্র – ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রনমিকাল ইউনিয়ন

১০. * বামন গ্রহ সেরেস এর পৃষ্ঠতলে আহুনা মন্স নামক গম্বুজের আকারে এমন এক পাহাড়ের খোঁজ পাওয়া গেছে যেটি ওই গ্রহেই অবস্থিত কাদা দ্বারা গঠিত। তথ্যসূত্র – স্পেস ডট কম

১১. * ইউনিভার্সিটি অফ কলরাডো বোল্ডার এর গবেষকরা এমন এক ন্যানো-বায়ো হাইব্রিড প্রাণীর আবিস্কার করেছেন যা বাতাস থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড আর নাইট্রোজেন নিয়ে পরিবেশ বান্ধব প্লাস্টিক আর জ্বালানী তৈরি করতে সক্ষম। তথ্যসূত্র – ইউনিভার্সিটি অফ কলরাডো বোল্ডার

১২. * একটি আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দল পৃথিবী থেকে মাত্র ১২.৫ আলোকবর্ষ দূরে টিগার্ডেন স্টার নামক এক তারার চারিপাশে পৃথিবীর আবহাওয়ার মত আবহাওয়া সম্পন্ন এক গ্রহের খোঁজ পেয়েছেন। তথ্যসূত্র – ইউরেকা অ্যালার্ট

১৯. * আমেরিকার পিটসবার্গের কার্নেগী মেলন ইউনিভার্সিটির গবেষকরা মস্তিস্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (মাইন্ড কন্ট্রোলড) রোবোটিক আর্মের আবিষ্কার করেছেন। তথ্যসূত্র – সায়েন্স ডেইলি

২০. * যুক্তরাজ্যের ল্যাঙ্কাশায়ারে অবস্থিত ল্যাঙ্কাস্টার ইউনিভার্সিটির গবেষকরা এমন এক ধরনের ইলেক্ট্রোনিক মেমোরির বিবরণ দিয়েছেন যার মধ্যে ডি-র‍্যাম ও ফ্ল্যাশ মেমোরি দুটোরই গুণ থাকবে ও এতে রেকর্ডিং করা বা এর থেকে তথ্য মুছে ফেলা ১০০ গুণ তাড়াতাড়ি হবে। তথ্যসূত্র – ল্যাঙ্কাস্টার ইউনিভার্সিটি

২২. * নাসার কিউরিওসিটি রোভার মঙ্গল গ্রহে বেশ ভালো পরিমাণে মিথেন গ্যাসের উপস্থিতির প্রমাণ পেয়েছে। এই মিথেন গ্যাস প্রাণের উপস্থিতির প্রমাণও হতে পারে আবার তা ভূতাত্ত্বিক কারণেও হতে পারে। তথ্যসূত্র – দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস

২৭. * নাসার ড্রাগনফ্লাই নামক মহাকাশযান সৌরমণ্ডলের চারিপাশে পর্যবেক্ষণের গঠিত নিউ ফ্রন্টিয়ার প্রোগ্রামের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। এই প্রোগ্রামটি ২০২৬ এ শুরু হবে। তথ্যসূত্র – দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস

২৮. * রাশিয়ার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পুশ্চিনো রেডিও অব্জারভেটরি থেকে ৯ টি ফাস্ট রেডিও বার্স্ট এর পর্যবেক্ষণ করেছেন। এই ফাস্ট রেডিও বার্স্ট গুলি অ্যান্ড্রমিডা গ্যালাক্সি আর ট্রিয়ামগুলুম গ্যালাক্সিতে দেখা গেছে। তথ্যসূত্র – পুশ্চিনো রেডিও অব্জারভেটরি ■

সংগঠন সংবাদ ঃ

জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলনে বিজ্ঞান মনস্ক

গত ১০ই জুন ২০১৯, কলকাতার এন আর এস মেডিকেল কলেজে এক বৃদ্ধের মৃত্যুর পর চিকিৎসার গাফিলতির অজুহাতে জুনিয়র ডাক্তারদের উপর হামলার প্রতিক্রিয়ায়, মূলতঃ ডাক্তারদের নিরাপত্তার দাবিতে জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলন গোটা রাজ্য এবং সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। মুখমন্ত্রীর অনড় মনোভাবের ফলে এবং আন্দোলনকারী ডাক্তারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকীর পর বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের সুপার, ডেপুটি সুপারসহ শয়ে শয়ে সিনিয়র চিকিৎসক গণ-ইস্তফা দেওয়া শুরু করে। অন্যদিকে রাজনৈতিক দল এবং মিডিয়ার বড় অংশ ডাক্তার ও রোগীর পরিবারকে পরস্পর পরস্পরের শত্রু হিসাবে দাঁড় করিয়ে সমস্যাটিকে উৎসমুখ থেকে ঘুরিয়ে দেওয়ার প্রয়াস নিতে থাকে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠন তিনটি বয়ানে পোস্টার দক্ষিণে সুন্দরবন থেকে উত্তরে শিলিগুড়ি শহর অবধি ছড়িয়ে দেয়। আমাদের পোস্টারের বয়ান ছিল **"ডাক্তার এবং রুগীর বিরোধ নয়, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এই বেহাল অবস্থার জন্য দায়ী সরকার।" "চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীদের নিরাপত্তার পাশাপাশি সমস্ত মানুষের চিকিৎসার উপযুক্ত পরিকাঠামো চাই।" "স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যবসা নীতির বিরুদ্ধে 'স্বাস্থ্য একটি সামাজিক অধিকার' এই দাবিতে জোট বাঁধুন।"**

১৪ই জুন আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের ডাকে রাজ্যের হাজার হাজার ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী সহ জনতার এক বিশাল মিছিলে এন আর এস মেডিকেল কলেজ থেকে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পর্যন্ত পথ পরিক্রমা করে। মিছিলে ডাক্তারদের সুনির্দিষ্ট কোনো বক্তব্য ছিল না 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' জাতীয় শ্লোগান ছাড়া। আমাদের কর্মীরা আমাদের প্রচারিত পোস্টার প্ল্যাকার্ড বানিয়ে মিছিলে হাজির হওয়া অধিকাংশ ডাক্তার এবং জনতা এগুলিকেই তাঁদের বক্তব্য মনে করে উৎসাহিত হন।

গত ১৬ই জুন কলকাতার ডায়মন্ডহারবার রোডের জোকা ই এস আই হাসপাতাল থেকে বেহালা-শখের বাজার মোড় অবধি এক প্রতিবাদী মিছিল এবং মোড়ে মোড়ে পথসভা করা হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে।

এরপর চলতে থাকে সরকার ও জুনিয়র ডাক্তারদের বোঝাপড়ার নানা প্রয়াস। শেষ অবধি ১৭ই জুন নবান্নে মুখ্যত নিজিদের নিরাপত্তার দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতিনিধিদের বৈঠক হয়। সরকার ডাক্তারদের নিরাপত্তার দাবিটি লুফে নিয়ে হাসপাতালগুলিতে আরও কড়া পুলিশী ব্যবস্থা লাগুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কিন্তু আন্দোলনকারীদের দ্বারা মৃদুভাবে উত্থাপিত স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত সংস্কারকে কার্যতঃ উপেক্ষা করেছে।

সংগঠন অখিল ভারত প্রগতিশীল ছাত্রমঞ্চ এবং সংযুক্ত সংগ্রাম কমিটি'র সাথে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার চরম অব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রচারপত্র নিয়ে ২৫শে জুন থেকে প্রচারে নামে। ১৭ই জুন আসানসোল শহরে প্রতিবাদ সভা হয়। রাজ্যের প্রায় ১৪টি জেলায় এই প্রচার আমরা সাধ্যমত ছড়িয়ে দিয়ে জনস্বাস্থ্যের জন্য সংগ্রামের প্রাথমিক পদক্ষেপ নিয়েছি। গ্রাম-শহরের সাধারণ শ্রমজীবী জনতা থেকে শহরের মেডিকেল কলেজের ছাত্র/ডাক্তারদের কাছে আমরা আমাদের বক্তব্য পৌঁছে দিয়েছি। এই বিষয় যে প্রচারপত্র আমরা প্রচারে নিয়ে গেছি তার সংক্ষিপ্ত অংশ প্রকাশ করা হল।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রের চরম অব্যবস্থার সমাধানে
'স্বাস্থ্য একটি সামাজিক অধিকার' এই দাবিতে জোট বাঁধুন!

"১০ই জুন এনআরএস মেডিকেল কলেজে ডাক্তারদের উপর হামলা কি কোনো নতুন ঘটনা? গত ২ বছরে পশ্চিমবঙ্গে ২৩৪টি ডাক্তার নিগ্রহের ঘটনা ঘটেছে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও ঘটেছে। দেশের অন্যান্য রাজ্যেও এমন ঘটনা বার বার ঘটছে।

এখন প্রশ্ন হল বার বার এমন ঘটছে কেন? ডাক্তার এবং রোগীর পরিবার কি পরস্পর পরস্পরের শত্রু? মানুষ হাসপাতালে আসেন রোগী বাঁচাতে, ডাক্তার পেটাতে নয়। ডাক্তার এবং হাসপাতাল কর্মীদের অধিকাংশই কার্যত পরিকাঠামোহীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সত্ত্বেও নিজেদের জ্ঞান এবং বিবেচনার উপর নির্ভর করে অধিকাংশ মানুষকে বাঁচান। আবার অনেকেই সঠিক চিকিৎসা না পেয়ে মারা যান। তখনই প্রিয়জনকে হারিয়ে রোগীর পরিবার পরিজন হতাশ হয়ে ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটান ডাক্তার এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর। সুতরাং হাসপাতালে ডাক্তার-রোগীর দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের জন্য সংঘর্ষরতরা দায়ী নন। দায়ী সরকার তথা সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার বেহাল দশা। হাসপাতালগুলিতে নতুন নতুন বিল্ডিং, সুদৃশ্য গেট এবং ঝকঝকে চেহারা এই বেহাল অবস্থার নগ্ন চেহারাটা ঢাকতে পারছে না। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় আপনারা তা জানেন। সারা দেশের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে চিত্র তা আরও স্পষ্ট করবে।

"... গত শতাব্দীর আটের দশকের জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলনের ফলে বেশ কিছু আংশিক দাবি অর্জিত হলেও সরকার জনগণের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেয়নি বরং আন্দোলন স্তিমিত হওয়ার পর নয়ের দশক থেকেই স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের নীতি জোরে সোরে লাগু করা শুরু করে। পুঁজিপতি-ব্যবসায়ীদের কাছে স্বাস্থ্যই হল

সবচেয়ে লোভনীয় পণ্য। সরকার জনস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে 'স্বাস্থ্য বেচে' পুঁজিপতিদের মুনাফার পাহাড় গড়ার পথ ধাপে ধাপে প্রশস্থ করে চলেছে।

বর্তমানে সরকারি হাসপাতালে ডাক্তার এবং স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ কার্যত বন্ধ। যেটুকু হয় তা হয় ঠিকেদারের মাধ্যমে বা ঠিকা প্রথায়। প্রতিটি সরকারি হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজের পরীক্ষাগার প্রাইভেট দেশী-বিদেশী কোম্পানির হাতে। ন্যায্যমূল্যের নামে যে ওষুধের দোকানগুলি খোলা হয়েছে তাও সব প্রাইভেট কোম্পানির হাতে। কেন্দ্র-রাজ্যের বাজেট বরাদ্দের সিংহভাগ খরচ হচ্ছে এইসব কোম্পানিগুলির যন্ত্রপাতি, ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয় করার জন্য এবং হাসপাতাল সৌন্দর্যায়নের জন্য। 'আয়ুষ্মান ভারত' বা 'স্বাস্থ্য সাথী' প্রকল্পগুলি লাগু হচ্ছে স্বাস্থ্যক্ষেত্রগুলিকে বীমা কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। গড়ে উঠছে ছোট, মাঝারি, বৃহৎ প্রাইভেট হাসপাতাল এবং নার্সিং হোম। ডাক্তারবাবুদের প্রাইভেট চেম্বারে বাড়ছে ভিড়। সরকার জলের দরে জমি দিয়ে, নানা কর মুকুব ক'রে প্রাইভেট হাসপাতালগুলির বেড়ে ওঠার পথ প্রশস্থ করছে।

সুতরাং এই ব্যবস্থায় 'পয়সা যার স্বাস্থ্য তার'। অন্যান্য পরিষেবার মত স্বাস্থ্যের খরচ বাড়ছে লাগামহীনভাবে। শ্রমজীবী পরিবারের কারো কঠিন অসুখ হলে চিকিৎসার খরচ জোগাড় করতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ছেন। এছাড়া সুষম ও নিয়মিত পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে অপুষ্টিতে ভোগা গরীব মানুষ প্রতিবছর ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, এনসেফালাইটিস, চিকুনগুনিয়া, ফাইলেরিয়া, টিবি, ডায়েরিয়ার মত জীবাণু সংক্রমণে হাজারে হাজারে মরছেন। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভাবনীয় সাফল্যের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন দেশের কোটি কোটি শ্রমজীবী জনতা। তাই 'অলৌকিক শক্তির দ্বারা রোগ নিরাময়', তন্ত্র-মন্ত্র, তাবিজ-কবজ-মাদুলির ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠছে।

বন্ধু,

বিজ্ঞান আমাদের শেখায়, কোনো সমস্যার উৎস নির্মূল না হলে তার সমাধানও হয় না। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্তির রাস্তা একটাই – স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক গণ আন্দোলন। **'স্বাস্থ্য একটি সামাজিক অধিকার'** এই নীতির ভিত্তিতে জনসাধারণের পর্যাপ্ত পরিমাণ সুষম খাদ্য এবং বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পাওয়ার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতির জন্য ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী এবং ব্যাপক শ্রমজীবী জনতার ঐক্যবদ্ধ জোটই এই দাবিকে ছিনিয়ে আনতে পারে। তাই প্রতিটি প্রগতিশীল, সমাজ সচেতন, বিজ্ঞান মনস্ক মানুষের কর্তব্য এই আন্দোলনে সামিল হওয়া।

আমাদের দাবি ঃ

*** স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ নীতি বাতিল কর। সমগ্র স্বাস্থ্যব্যবস্থা বিনামূল্যে চালু কর।**

*** গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ব্লক-জেলা হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজগুলি এবং অন্যান্য সরকারি হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করতে হবে।**

*** গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে মেডিকেল কলেজ সর্বত্র যথেষ্ট সংখ্যক বেড, স্বাস্থ্য পরীক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা, ওষুধ, প্রয়োজনীয় ক্লিনিক্যাল ও নন ক্লিনিক্যাল সরঞ্জাম-এর ব্যবস্থা করতে হবে।**

*** শ্রমজীবী জনতার জন্য সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করতে হবে।**

*** যাবতীয় স্বাস্থ্য বীমা বাতিল করে সকলের জন্য বিনামূল্যে সর্বাধুনিক চিকিৎসার দায় সরকারকে নিতে হবে।**

*** প্রতিটি জেলায় মেডিকেল কলেজ এবং প্রতি ব্লকে সরকারি সুপারস্পেশালিটি হাসাপাতাল গড়তে হবে।**

*** জনমুখী বৈজ্ঞানিক স্বাস্থ্যনীতি, ওষুধনীতি এবং সুসংহত মেডিকেল শিক্ষানীতি গ্রহণ কর।**

*** স্বাস্থ্যের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে।■**

কলকাতায় আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তারদের মিছিলে সামিল জনতা

দক্ষিণ ২৪ পরগণার কলাগাছিয়া হাইস্কুলে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান

গত ৫ই জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার আশুতি অঞ্চলের কলাগাছিয়া হাইস্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে 'সাপ থেকে আতঙ্ক ও মুক্তি' এবং অলৌকিকতা বিরোধী আলোচনা সভা ও সেমিনার করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন।■

সহযোগিতা রাশি ঃ ১০.০০ টাকা Registration No.: S/IL/97407 of 2012-13

হুমকী ও বাধা এড়িয়ে হাওড়ার পুরাশে (আমতা থানা) আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ২৮শে জুলাই আমতা ইউনিটের পক্ষ থেকে হাওড়া জেলার কানপুর সেবা সংঘের সভাগৃহে একটি আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচীর প্রচার হয় মাসাধিকাল ধরে। গত ২৫শে জুলাই পূর্ব প্রতিশ্রুতিমত সরকারি কৃষিবিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় ৬০ জন কৃষককে নিয়ে বিজ্ঞান মনস্ক'র উদ্যোগে প্রশিক্ষণ শিবির হয়। এরপরই গত ২৭শে জুলাই স্থানীয় কিছু রাজনৈতিক নেতারা সেবা সংঘে বিজ্ঞান মনস্ক'র প্রোগ্রাম করা যাবে না বলে হুমকী দেয় ক্লাব কর্তৃপক্ষকে। সন্ধ্যায় জানা যায় অনুষ্ঠান হবে না। তখন আমাদের সদস্যরা কানপুর গ্রামের অন্যত্র (যেখানে কৃষকদের প্রশিক্ষণ শিবির হয়েছিল) ব্যবস্থা করে। রাতে জানা যায় ওই স্থানেও নাকি প্রোগ্রাম করা যাবে না বলে গৃহকর্তাকে হুমকী দেওয়া হয়েছে। আমাদের কর্মীরা তখনই সিদ্ধান্ত নেয় কর্মসূচী বাতিল করা হবে না এবং রাতে সিদ্ধান্ত হয় পুরাশ গ্রামের বণিকপাড়া'র আটচালায় অনুষ্ঠান হবে। এই প্রোগ্রামেও জনসাধারণকে আসতে বারণ করা সত্ত্বেও নির্দিষ্ট দিনে অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়।

স্থানীয় মেয়েরা নৃত্য, গীত ও আবৃত্তি করেন। আলোচনার বিষয় ছিল "বিজ্ঞান ও কুসংস্কার"। ৬ জন বক্তা এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন। পুরাশ-কানপুর নটবরপাল বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বলেন "যুগ যুগ ধরে চর্চিত আচার-আচরণ ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে চলে আসা রীতি-নীতিকে আমরা সংস্কার বলি। এগুলির মধ্যে যা সমাজের বা মানুষের ক্ষতি করে তা হল কুসংস্কার। ইংরাজীর ১৩ নং সংখ্যা, পরীক্ষার আগে ডিম, আলু ইত্যাদি না খাওয়া (ওগুলো গোল বা শূন্যের মত বলে), বেড়ালে রাস্তা কাটা আরও অসংখ্য কুসংস্কার আমাদের ছেয়ে আছে। এইসব কুসংস্কারের কোন যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ থাকে না। আবার গুরুজনদের শ্রদ্ধা করার মত সংস্কারও আছে যা ভাল। কুসংস্কারের সাথে বিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই।" সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয় "যুগ যুগ ধরে প্রচলিত সংস্কারগুলিকে মানুষ যুগে যুগে কুসংস্কার বলে বাতিল করে এসেছে। বিজ্ঞান হল বস্তুর বিকাশের নিয়ম বা কারণ। বস্তুর সৃষ্টি থেকে বিবর্তন এবং ধ্বংসের নিয়ম বা কারণ এবং সে সম্পর্কিত জ্ঞানই হল বিজ্ঞান। বিজ্ঞান 'আর্শীবাদ না অভিশাপ' এই কথাটা বলা অর্থহীন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে থাকায় এবং কেউ তার অপপ্রয়োগ করলে বিজ্ঞান অভিশাপ হয় না।"

সভায় উপস্থিত শিক্ষক সমাজ এবং কৃষিজীবী তথা নানা পেশায় যুক্ত গ্রামীণ মানুষ ও ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এরকম একটা শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে যারা বাধা সৃষ্টি করেছে তাদের সমালোচনা করেন এলাকার সুধীসমাজ। সভায় ইউনিটের দ্বারা এযাবৎকাল যে অনুশীলন হয়েছে তার প্রতিবেদন পেশ করা হয়।■

বিজ্ঞান মনস্ক'র পক্ষে নন্দা মুখার্জী প্রযত্নে অপন মোতিলাল, দিপ্তীকণা অ্যাপার্টমেন্ট, ১১৪ মাঝিপাড়া রোড, ফ্ল্যাট নম্বর এ ২, কলকাতা - ৭০০০৬৩, কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ৩০, বিধান সরণী, কলকাতা - ০৬ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ শিশির কর্মকার – ৯৪৩২ ৩০০৮২৫ প্রকাশক ঃ নন্দা মুখার্জী ঃ ৯৮৮৩ ২৯৯৯২৮
Email : samikshan2009@gmail.com Website : www.samikshan.com